মা আনন্দময়ীর আগমনে

শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা আনন্দময়ীর আগমনে
প্রকাশক শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
প্রধান কার্য্যালয় ঃ কনখল, হরিদ্বার-২৪৯৪০৮

দ্বিতীয় প্রকাশঃ শুভ গুরুপূর্ণিমা, জুলাই ২০০৬

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN 81-89558-21-8

মূল্য ঃ ৪০.০০

প্রচ্ছদ অঙ্কণ ঃ শ্রী চিত্তরঞ্জন পাকরাশী

মুদ্রক ঃ ইস্ট ওয়েষ্ট পাবলিকেশন
সি ১৪৮ গ্রেটার কৈলাশ -১
নতুন দিল্লী- ১১০০৪৮

প্রস্তাবনা

"শ্রী অরুন প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "মা আনন্দময়ীর আগমনে" পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ ১৯৪২-সনে- অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বছর আগে লক্ষ্ণৌ-এর ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রী মায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ও শ্রীমার ক্রমবিকাশ ও স্ফুরনের ঐ অধ্যায়টিতে লেখক লক্ষ্ণৌতে একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে প্রায়ই লক্ষ্ণৌ ও বেনারসে আসতেন এবং ভক্তদের সান্নিধ্যে একনাগারে কয়েকদিন বা সপ্তাহ কাটাতেন এবং তাঁদের জীবনের সুখ দুঃখ, ভয় ভীতি, ধর্মজীবনের কর্ত্তব্য ও দায় এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় —প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশ্নের, নানা উপমা-সহ, জবাব দিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক পথে টানবার প্রয়াস করতেন।

১৯৪২ সনে মা যখন লক্ষ্ণৌ-এ এসে গোমতী নদীর তীরে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছেন তখন শুধু সাধারণ ভক্তরাই নন, ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী, ডঃ পান্নালাল আই.সি.এস্ প্রভৃতি বিদ্বজ্জনেরাও মায়ের দরবারে এসে হাজির হতেন। ধর্মপিপাসু, ইতিহাস ও এবং ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরার অনুরাগী অধ্যাপক বন্দোপাধ্যায় মায়ের স্বরূপটি জানবার ও তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্তির আশায় প্রায়ই 'মা'এর দরবারে পৌঁছে যেতেন। মা'য়ের সাথে যা কথাবার্ত্তা হতো বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন এবং মা'য়ের জবাব, মাতৃ বানীর অফুরন্ত অমৃতধারা, এবং

মাঝে মায়ের ভাব ও 'লীলা' তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল— সবকিছুই প্রতিদিন তাঁর 'দিনপত্রীতে' (Diary) লিখে রাখতেন। 'মা আনন্দময়ীর আগমনে' পুস্তকটির উৎস ঐ দিনপত্রীতে সযত্নে রক্ষিত তথ্যাবলি ও লেখকের মাতৃরূপ দর্শন ও মাতৃলীলার অনুভূতি ও উপলবদ্ধি।

এই পুস্তকের সবকটি অংশই সুখপাঠ্য। শেষের অংশে লেখকের ভাষায় মন্তব্যে এবং মাতৃস্বরূপের ব্যাখ্যায় এটা সুস্পষ্ট যে তিনিও মহাসাধক ভাইজীর মত বিশ্বাস করতেন যে মা আনন্দময়ী ছিলেন নিখিল ব্যাপিকা, বেদপ্রকাশিকা ও স্বয়ং প্রণবরূপিনী।

এই বহু পুরাতন অথচ চিরনূতন এবং মূল্যবান পুস্তকটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে আমরা শুধু মায়ের সেই বিদগ্ধ ভক্তের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাই নিবেদন করছিনা, শ্রীশ্রী মায়ের চরণেও জানাচ্ছি অজস্র প্রণাম আমাদের এই পুস্তকটি পুনমুদ্রনের প্রেরনা জোগানোর জন্য। সবইতো তাঁরই ইচ্ছা।

সুনীল গুহ
আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় প্রকাশন বিভাগ।

শুভ গুরুপুর্ণিমা
কনখল, জুলাই ২০০৬

প্রথম সংস্করণে

লেখকের নিবেদন

যাঁহারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে লক্ষ্ণৌএ দেখেন নাই বা আবার তাঁর দর্শন পেতে চান তাঁদের তৃপ্তির জন্য আমার ডায়েরীর কয়েকটি ছিন্নপত্র প্রকাশিত হইল। কষ্ট করিয়া বা চেষ্টা করিয়া এখানে কিছুই লেখা হয় নাই। যেমন যেমন ঘটিয়াছে ও তাহা যেরূপভাবে চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সব কথা যে বলা হইয়াছে বা কোনও কথা যে বাদ নাই, এমনও বলা চলে না। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কথাগুলি লেখকের অন্তরে যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ঘরে ফিরিয়া সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার কথাগুলি ও তাঁহার বলিবার ভঙ্গিমা, লেখকের সামর্থ অনুয়ায়ী রক্ষিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য তাঁর স্বরূপ ও বাণীকে আরও আপনার করিয়া লওয়া। আশা করি সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি মার্জ্জনীয় হইবে।

পাণ্ডুলিপি হইতে রচনাটিকে উদ্ধার করিয়া পুস্তকের আকার দিবার দায়িত্ব ও ভার লইয়াছেন পুস্তক প্রকাশক ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ হইবে তাহা সমস্তই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মহিলা আশ্রমের তহবিলে জমা হইবে।

লক্ষ্ণৌ
মহাষ্টমী, অক্টোবর, ১৯৪২ } শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ (দর্শন ও শ্রবন)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ দর্শন	১
২ কথাবার্ত্তা	৫
৩ মাতাজীর দরবার সকালবেলা	২২
৪ মাতাজীর দরবার বৈকালবেলা	৩১
৫ মাতাজীর অদর্শনে	৪১

দ্বিতীয় ভাগ (স্মরণ ও চিন্তন)

১ ধর্ম্মজীবনের দুইটি বিশেষত্ব	৪৭
২ দ্বন্দ্বের সমাধান	৫৪
৩ মন্দির প্রতিষ্ঠা	৬৭
৪ ভক্তি ও যোগ	৭৬
৫ জ্ঞান ও কর্ম্ম	৮৭
৬ আপ-জ্যোতি-রস-অমৃতম্	১০১
৭ ধর্ম্মজীবনে বাধাবিঘ্নের গ্রন্থি খোলা ...	১০৩
৮ একটি অসমাপ্ত কাহিনী	১১২

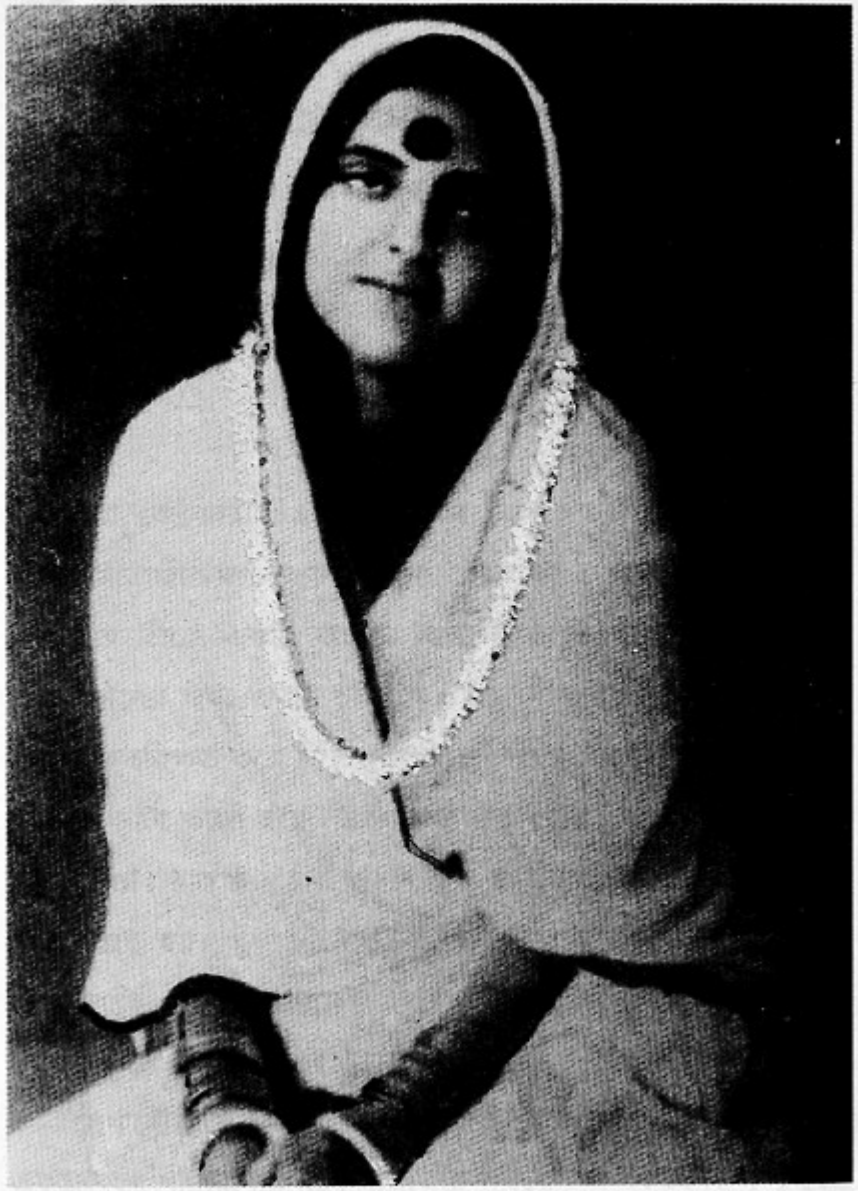

প্রথম ভাগ

(দর্শন ও শ্রবণ)

(১)

দর্শন

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪২। বৈকাল বেলা। কর্ম্মস্থান থেকে ফিরে এসেই মাতাজীর দর্শন পাবার জন্য বেরুলাম। পেপার মিলের কাছে, গোমতীর তীরে, একটি বাগানে মাতাজী তাঁবুর মধ্যে বাস করছেন শুনে দর্শনের জন্য তথায় চলিলাম। মনে নানাবিধ বিষয়-চিন্তা এসে মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল। নদীতীরে পথ দিয়ে যেতে যেতে আবার মনটা তাজা হয়ে উঠল। তখনও রৌদ্র বেশ আছে। বাতাস কিন্তু ঠাণ্ডা। রাস্তায় দু'চার জন লোক যাতায়াত করছে। গাড়ীঘোড়া নাই বল্লেই হয়। একখানা মোটর পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি যে দিকে যাচ্ছি সেই দিক থেকেই এল। আমার দৃষ্টি সোজাসুজি মাতাজীর স্থানের দিকে। আমি চলেইছি।

সেখানে গিয়ে স্থানটি বেশ ভাল লাগল। কয়েকটি হিন্দুস্থানী ভক্ত একটা বৃহৎ শামিয়ানায় বসে মাতাজীর সম্বন্ধে গল্প করছেন। একটু দূরে একজনকার থাকবার মত একটি ছোট তাঁবু দেখা যাচ্ছে।

মাতাজীর সম্বন্ধে নানা কথা কানে এল। "তিনি ভক্ত নন, স্বয়ং ভগবান" ইত্যাদি। তাঁহারা আদর করে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাতাজীর সম্বন্ধে যা কিছু মন্তব্য করছিলেন শুনতে আমার ভালই লাগছিল। কে একজন এমেরিকান্ মহিলাকে শ্রী অরবিন্দ নাকি মাতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন। তিনি কত ভক্তিভরে শাড়ী পরে দেখা করতে আসতেন। পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের মধ্যে ভক্তি, আমাদের মধ্যে তেমন শ্রদ্ধা নাই কেন? এই কথাবার্ত্তা শুনছিলাম।

আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। জানলাম—মাতাজী মোটরে করে বেরিয়েছেন। বুকের ভিতরটা ঝনাৎ করে উঠ্‌ল। তবে কি সেই মোটরেই মাতাজী চলে গেছেন? আমার পথেই তো পড়েছিল! উঠে গিয়ে বাগানে একটু বেড়ালাম। বাগানের সঙ্গে নদীর উপর একটি প্রাইভেট ঘাট আছে। সেইখানে কতক্ষ দাঁড়ালাম। সূর্য্য অস্ত যাবার সময় হোল। পাখীরা নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। দু'চারটি করে আরও লোকের ভিড় জমে উঠতে লাগল। ভাবলাম তাঁবুতে গিয়ে বসি।

সেখানে যেতেই একটি যুবক, মাথায় অনেক চুল, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুনলাম, মাতাজীর সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়ান। তিনি আর একটি যুবকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। "চারবাক্ প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর আস্থা স্থাপন করতেন, ন্যায়শাস্ত্র অনুমানের উপর জোর দিয়েছে। সব ঠিক। এ ছাড়া আরও পথ আছে। Fourth Dimension সম্বন্ধে এখনও ঠিক হোল না। একবার প্রমাণ হলে তখন ত শামিয়ানা থাকতেই এটা ফুঁড়ে ওদিকে গিয়ে বেরুনো যাবে।" ইত্যাদি। আমার মন মাতাজীর দর্শন চিন্তায় নিবিষ্ট। পথের মধ্যে তো দেখা হয়। কিন্তু আমার তো সাধন ভজন কিছু নাই। তাই দেখা হয়েও দেখা হয়না! শুনলাম ঐ

যুবকটি মাতাজীর সম্বন্ধে বাংলায় একখানি পুস্তক লিখেছেন। তাঁর কাছ ঘেঁসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ও বইখানি একটিবার চাইলাম। তখনও একটু আলো ছিল। আলো থাকতে থাকতে একবার চাইলাম। যুবকটি এনে দিলেন। বইখানির উপর যুবকটির নাম শুধু "অভয়" লেখা আছে। পাতা উল্টাতে গিয়া মাতাজীর ছবি চোখে পড়ল। ছবিটা এক মনে দেখ্‌তে লাগলাম। খুব ভাল লাগল। ছবিতে প্রথম দর্শন হয়ে গেল। আলো কমে আসছিল। পড়তে আর ইচ্ছা হোল না। যা পেলাম তাই নিয়ে বসে রইলাম।

মোটরের শব্দ কানে এল। সকলে বল্লেন, মাতাজী আসছেন। মনটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। গোধূলির শেষ আলোটুকুতে মাতাজী প্রকাশ হলেন। ছবির চেয়ে রোগা লাগ্‌ল। মাথার চুল খোলা, গায়ে শাল জড়ানো, পরণে শাদা কাপড়। তাঁবুতে তাঁর জন্য একটা বিশেষ আসন পাতা হোল, সেইখানে তাঁকে বসানো হোল। জোশীজী (Retired Inspector of Schools) কিটসনের একটা বড় আলো এনে যথাস্থানে রাখলেন। বল্লেন "মাতাজী দিয়া জ্বালা হয়েছে।" বলেই দুর থেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সন্ধ্যার প্রণামটুকু তিনি একাই সাঙ্গ করলেন না। আমাদের সকলের মাথা নত হোল। যিনি অন্ধকারের পারে, জ্যোতির্ম্ময়, তাঁর উদ্দেশ্যে অজানা পথের কয়েক জন পথিক মাতাজীকে লক্ষ্য করে সেই অসীম দেবতার চরণেই বন্দনা জানালেন।

আমি তাঁবুর একটি পাশে বসেছিলাম। যথেষ্ট শীতবস্ত্র গায়ে ছিল না। মনে করে বেরিয়েছিলাম যে দিনের আলোতেই বাড়ী ফিরতে পারব। তাই নিয়ে যাই নি। অভয় আমাকে বল্লেন, "আপনি আর একটু এগিয়ে এসে বসুন না!" আমি বল্লাম, "শীঘ্র পালাব বলে এক পাশে বসে আছি।" অভয় বল্লেন, "পালাবেন কেন?" আমি বল্লাম, "ঠাণ্ডা

পড়ছে কিনা। দেখ্‌ছেন না, বেশ ঠাণ্ডাবাতাস দিতে আরম্ভ করেছে। আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে।" অভয় উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন, "মা, ইনি বল্‌ছেন, ঠাণ্ডা লাগবে তাই শীঘ্র পালাবেন।" শ্রীশ্রী মা শুনতে পেয়ে একমুখ হেসে বল্লেন, "হাঁ ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে কেন?" আমার প্রতি প্রশ্ন করলেন, "বাবা ঠাণ্ডা লাগে কোথায়? সেখানে কি ঠাণ্ডা গরম কিছু আছে?" তাঁর হাসিটুকু মনকে স্নিগ্ধ করে দিল।

কয়েক জন মালা নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। একটির পর একটি মালা মাতাজীর গলায় শোভা দিতে লাগল। তাঁর কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখলাম না। সেইরূপ মুখে প্রসন্নতার হাসি লেগেই আছে, মাথাটা একটু পেছনদিকে ঝুঁকে আছে। শরীরটা প্রায় স্থির হয়েই আছে। চোখদুটি সকলের দিকেই। তবে কা'কে দেখছেন বুঝতে পারা গেল না। কিংবা হয়ত নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছেন, তা'ও বোঝা যায় না।

হিন্দুস্থানী মহিলারা তাঁর কাছে ঘনিষ্টভাবে বসলেন। আমার খুব ভাল লাগল। একটি মহিলাকে আলাদা দেখে তৃপ্তি হয় না। ভারতবর্ষের সকল মেয়েকে ও তাঁদের সাধনস্বরূপের উদ্দেশ্যে আমি প্রণাম জানালাম। মাতাজীকে আর পৃথক করে প্রণাম করবার কথা মনে এলো না। আমি চুপ করে পাশ কাটিয়ে, তাঁবু থেকে যতদূর সম্ভব সকলের অলক্ষ্যে, চোরের মত প্রস্থান করলাম। অন্তরে রয়ে গেল আমার চোরাই মাল। মায়ের ছবিখানি সেখানে মুদ্রিত হয়ে গেল। মনে হোল, হয়ত এ ছবি কাল প্রভাতে নূতন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তা'ও যদি হয়, এও আমার পক্ষে অনেক নয় কি? ভগবানের দর্শন যাঁরা পান তাঁদের ভিতর দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই, এই

মনে করে সেখানে যত নরনারী বালক বালিকা বসেছিলেন সকলের উদ্দেশ্যে নীরবে প্রণাম জানিয়ে, সেখানকার আলো থেকে আমি বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে দেখলাম আকাশে প্রতিপদের চাঁদ নদীর জলের উপর ঝিক্ ঝিক্ করে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার মনটা কি স্থির না অস্থির? আর কি ঠাণ্ডা লাগবে? কত কথা, কত চিন্তা কত আবেগ, মনের মধ্যে উঠ্‌তে লাগল। আর ঐ ছোট্ট নদী গোমতী যেমন নীরবে বয়ে যাচ্ছে আমিও সেই মত ভেসে চল্লাম, ঘরের পানে।

(২)

কথাবার্ত্তা

পরের দিন। ভোরে উঠে মনে হোল, আর মাতাজীর কাছে যাব না। কি হবে? নিজের দৈন্যের বোঝা নিয়ে চুপ করে নিভৃতে পড়ে থাকাই ভাল। কিন্তু কলেজ থেকে ফিরে এসেই একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। জল খাবার খেয়েই ছুটলাম, সেই নদীর ধারের সেই বাড়ীতে, সেই মাতৃস্বরূপিণী মূর্ত্তির কাছে, যাঁর স্বরূপটি আমার মত অস্থির-প্রকৃতির-মানুষটির অন্তর সারাদিন অলক্ষ্যে ভরেছিল।

গিয়ে দেখি নদীর ধারে ঘাটটিতে এক গাদা লোকের মধ্যে বসে রয়েছেন মাতাজী। লোকগুলি যেন মিলে মিশে ফুলের মালার মত তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। আকাশে যথেষ্ট রৌদ্র : নদীর জল হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। আমার সলজ্জভাব সহজেই কেটে গেল। একটু যেন মুখর হয়ে পড়লাম। ঐত আমার দোষ! যখন চুপ করে ভাল ছেলেটির মত এগুলো ভাল, আমি তখন বেশী কথা কইতে চাই।

আর যখন কথা বলবার সময় আসে তখন চুপ করে সবটুকু জানাতে চাই। কোথায় যে কথা বলার ও চুপ করে থাকবার সীমানা তা' আমার মনেই থাকে না।

প্রণাম করতে ভুলে গেলাম। হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে সতরঞ্চির উপর বসে পড়ে দেখি মাতাজীও হাত জোড় করে রয়েছেন। ভালও লাগল, আবার লজ্জিতও হোলাম। লজ্জার ভাব গোপন করে বল্লাম, "মাতাজী কাল অতো শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে পালালাম, পথে কিন্তু বারবার মনে হোল, না জানি কত অপরাধ হয়ে থাকবে, কাল যদি আবার আসা হয়, এ রকম আর হতে দেব না। আজ পথে আসতে আসতে ভাবলাম, কাল যেমন আমি সব প্রথমে উঠে গিয়েছিলাম আজ আমি সবাইএর আগে গিয়ে উপস্থিত হ'ব। কিন্তু দেখছি আমার আগে এঁরা সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

সকলেই মৃদু মৃদু হেসে উঠলেন। মাতাজী বল্লেন, "বাবা, মেয়ের কাছে বাবা আসবে, এতে সব আগে, সব শেষে, কি আছে? আচ্ছা বলত, কাকে তুমি সব আগে বা সব শেষে বলো? সব আগে সব শেষে বলে কি কিছু আছে? আবার আছেও বটে। কিন্তু সত্যিকার বল্‌তে গেলে যা সব আগে তাইত সব শেষে। আবার মধ্যেও তাই নয় কি?

আমি একটু অপরাধীর সুরে কথাটা নিজের তরফ থেকে ব্যক্তিগত করতে গিয়ে বল্লাম, "তা নয় মাতাজী, কাল আমি আগে থেকেই এসেছিলাম, তারপর এসেই যখন শুনলাম, আপনি মোটরে কোথাও গিয়েছেন তখন ভারি কষ্ট হোল। আমি এতদূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলাম, আর মাতাজী কি না টপ্ করে মোটরে করে কোথায় চলে গেলেন! তা'ও পথ দিয়ে মোটর চলে গেল অথচ আমি তাঁকে দেখতেও পেলাম না!"

মাতাজী বল্লেন, "তোমাকে কিন্তু দেখা গিয়েছিল। আর তখনই বোঝা গিয়েছিল যে তুমি এখানেই আসছিলে।"

আমি একটু স্তম্ভিত হলাম। মোটরে চড়ে যাঁরা যান তাঁরা ত পথের হেঁটে চলা পথিকদের দেখ্‌তে পান না। মাতাজী আমাকে জানেন না, চেনেন না, তবে জানলেনই বা কেমন করে, চিনলেনই বা কেমন করে, আর দেখ্‌লেনই বা কেমন করে? আমি যখন মোটরে বসে যাই আমিও ত পথে হাঁটা মানুষদের দেখবার অবসর পাই না। একি হোল? তবে কি মাতাজী আমাদের চেয়ে পৃথক? ঐ যে আমার সামনে খোলা চুল, শাল গায়ে দিয়ে, হাসিমুখে ভদ্র মহিলা বসে আছেন, ওঁকে আমাদের থেকে পৃথক করতে আমার একটুও ইচ্ছা করল না। মাতাকে সন্তান যেমন আলাদা দেখ্‌তে পারে না, আমি ও তেমনই পারলাম না।

মাতাজী হাসিমুখে বল্লেন, "বাবা, পিতাপুত্রীর মধ্যে দূরত্ব কি আছে?

মনের মধ্যে দেখলাম, তাইত, মাতাজী পুত্রী হয়ে গেলেন, আমরা সবাই পিতার আসনে উঠে গেলাম। সত্যই ত, তিনি সংসারের পুত্রী, সারা সংসার তাঁর পিতা। সংসার বৃদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হয়ে মৃত্যুমুখে পড়ে। পুত্রী চিরকাল নবীনা থাকেন, অমৃতময়ী হয়ে থাকেন। আর সারা সংসার তাইত চায়। আমারও মনটা আশীর্ব্বাদে ভরে উঠ্‌ল। কিন্তু কে কা'কে আশীর্ব্বাদ করে? কাল যাঁকে বিশেষ করে প্রণাম করতে পেলাম না বলে পরে মনে অনুশোচনা হয়েছিল আজ তাঁকেই আশীর্ব্বাদি করতে পেলে বাঁচি, এমনই ভাবে মনে এল? এ যেন ঐ নদীর বুকে লহরের পর লহর যেমন উঠ্‌ছে আর পড়ছে তেমনই ভাবে। কিন্তু তারই ভিতর দিয়া নদীর প্রাণ এগুতে থাকছে। আমারও মনের

ওঠাপড়ার সত্ত্বেও আমার প্রাণটা এগুতে চাইল। দেখ্‌লাম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রাধাকুমুদ বাবু ওঠবার জন্য ব্যস্ত হলেন। মনে হোল, হয়ত আমার চপলতা ওঁর ভাল লাগছিল না। মনকে সংগ্রহ করে ভাবলাম, আচ্ছা, এবার চুপ করে থাকব, তাইত, অপর সবারও ত কথা কইবার আছে।

রাধাকুমুদ বাবু কাছে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সকলের দৃষ্টি মাতাজীর উপর। আমি কেবল নদীর পানে চেয়ে বসে রইলাম। কিন্তু সবাই নীরব। এত চুপচাপ আমার ভাল লাগ্‌ল না। মাতাজীর মুখের দিকে চাইলাম। আমার চুপ করে থাকবার ইচ্ছা কোথায় লোপ পেয়ে গেল। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না! চেয়েও থাক্‌ব, অথচ কথাও ক'ব না। এত সংযম আমি কোথায় পাব? আমিই আরম্ভ করলাম, বল্লাম, "মাতাজী, আজ সকালে গীতা পড়তে পড়তে একটা শ্লোক, যা' পূর্ব্বেও অনেকবার পড়েছি, তার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। শ্রীভগবান্ বলেছেন, "সর্ব্বধর্ম্মাণ্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ।" মাতাজী, শ্রীভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন কেন? আমি ত জানি, অধর্ম্মকে ত্যাগ করে ভগবানের কাছে যাবার উপায় হয়, এখানে ধর্ম্মকে ত্যাগ করতে বলা হোল কেন? শুনুন শ্লোকটার এই অংশ বলি।" এই বলে বাঙলা অর্থ টুকুও নিজের কাছেই আওড়াতে লাগলাম, মাতাজীর মুখপানে চেয়ে।

মাতাজী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমারই মনের কথা বল্লেন, "বাবা, গ্রন্থ ত পড়া নেই। যেমন আসে, তেমনই বলা হয়। কেমন নয়?

এ তো আমারই মনের কথা। তবে মাতজীর মুখে শুনে আরও

ভাল লাগ্‌ল। যিনি উত্তর জানেন ও পেয়েছেন তাঁর মুখে এ'টা সহজ কথা। আমার মুখে সহজ নয়। কারণ আমি গ্রন্থ পড়ি। যখন কিছু বুঝি সেটা আমার নিজের গুণে বুঝি, আর যেটা বুঝতে পারি না সেটা গন্থের দোষ, আমার নয়। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা' বলেন, আমি বুঝতে পারলেই সেটা আর শ্রীকৃষ্ণের কথা নয়। সেটা আমার মনের কথা তিনি চুরি করে বলেছেন মাত্র। আর যেটা আমি বুঝতে পারছি না, সে সব কথা তিনি যে বলেছেন, তা'তে তাঁর কিছু ভাল হয় নাই, কারণ আমি যখন বুঝলাম না তখন নিশ্চয়ই সে কথায় গোল আছে। এইরূপ বুদ্ধিতে আমি কোথায় পড়ে আছি ও মাতাজী কোথায় রয়েছেন। তাই যে কথাটি আমার নিজের মুখে বলা উচিত ছিল তা তিনি আমার অন্তরে প্রকাশ করে দিলেন।

মাতাজী বলতে লাগলেন, "দেখ বাবা, ধর্ম্ম বল্‌তে কি বোঝায়? এই দেখ না, নদীর একটা ধর্ম্ম আছে, আছে ত? ঐ ফুল গাছের একটা ধর্ম্ম আছে ত, কেমন , বল? "

আমি সম্মতি জানালাম।

মাতাজী বল্লেন, "সেই রকম মানুষেরও ত ধর্ম্ম আছে, কেমন কি না? একটা ধর্ম্ম কেন? সে যে পরিবারের মানুষ, তার একট' ধর্ম্ম থাকতে পারে। আবার সমাজের একটা ধর্ম্ম থাকতে পারে।"

আমি বল্লাম, "তা'ত থাকবেই, মতাজী, কথায় বলে কুল ধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্ম, দেশাত্মক ধর্ম্ম, শাশ্বত ধর্ম্ম, ইত্যাদি।"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, তবেই বল, তারপর হিন্দু, মসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি আবার সাম্প্রাদায়িক ধর্ম্ম রয়েছে। কেমন নয়? এখন মানুষ কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা রাখ্‌বে বল?"

একটু থেমে বল্লেন, "তাই এখানে বলা হয়েছে, শরণাগত হবার কথা। শরণ লওয়া কাকে বলে? যখন মানুষ আর তাঁকে ভিন্ন জানে না, কেমন ত? তাঁর শরণ নিতে হলে কি দরকার? আমি যা

ধরে আছি সব ত আমাকে ছাড়তে হবে? তবেই ত তিনি আমাকে ধরতে পারবেন? তারপর যেই জানব, তিনিই ধরে আছেন, তখন ত সব ধরা ঠিক হয়ে যাবে। কারণ তিনিই ত সব। সব ছাড়া কি, বাবা, তিনি আছেন? তুমিই বল, এই সবই ত তিনি?" এই বলে আকাশ থেকে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত হাত বাড়িয়ে দেখালেন।

"দেখ বাবা, আর একটি কথা। এখানে বলা হয়েছে একম্। অর্থাৎ এককে। ভিন্ন ভিন্নকে নয়। সেই এক কোথায়? তিনিই ত এই সকলের অন্তর জুড়ে রয়েছেন।"

আমি আমার অন্তর খুঁজে আবার চক্ষু মেলে মাতাজীর দিকে দেখ্তে লাগলাম।

মাতাজী স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন," কেমন বাবা, হোল ত?"

যেটুকু অর্থ কথায় ছিল না তা' তাঁর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হোল। আমিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, প্রশ্ন তিনিই দেন্, আর উত্তরও তাঁর কাছ থেকেই আসে।"

আমি ভাবলাম, তবে কি মাতাজী নিজেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন? না তাঁর স্বরূপ আমার কাছে আরও প্রসার লাভ করছে? কিন্তু সামনে মাতাজীকে রেখে ভাববার সময় নাই। আমি বল্লাম,"মাতাজী, সকালে যিনি মনের মধ্যে প্রশ্ন দিয়েছিলেন, আশা করে বসেছিলাম, সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই তিনিই যদি দয়া করে উত্তর দেন। তাতো হয়ে গেল। এখন বলুন দেখি, এসব গ্রন্থ ট্রন্থ পড়া ভাল কি?"

মাতাজী উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, "হাঁ খুব ভাল। সব ভাল গ্রন্থ পড়বে। ভাল কি জান? যা তাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর কথা

বলবে, তাঁর কথা ভাববে তাঁর কথাই শোনবার চেষ্টা করবে। তিনিময় হয়ে থাকবে, বাবা। তিনি তুমি কি আলাদা, বাবা? তুমি তাঁর, তিনি তোমার এও যেমন কথা, আবার তুমি তিনি ও তিনি তুমি এ'ও ঠিক সেই একই কথা।"

রূপ কথার গল্পের মত সোনার কাঠী কে যেন আমার অন্তরে বুলিয়ে গেল। তার হাতখানি দেখ্তে পেলাম না। কিন্তু সমস্ত অন্তর উন্মত্ত হয়ে, মাতাল হয়ে উঠ্ল। আবার শিশুর মত চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করল, যদি আবার পরশ পাই।

আমি বল্লাম, "মাতাজী, এ কিন্তু বড় কষ্ট। যত পড়ব, ততই মনে প্রশ্ন উঠ্বে, একটার পর আর একটা। এর তো শেষ নাই। তারপর উত্তরের জন্য বসে থাকতে হবে। আজ যেমন প্রশ্ন উঠল, আজই উত্তর এল, এমন ত আর রোজ হবে না? তবে বলুন দেখি, এ কি রকম দক্ষানি?"

মাতাজী হেসে বল্লেন, "হাঁ বাবা, এ দক্ষানি ভাল। আর সবের চেয়ে ভাল নয় কি? তুমিই বল, ভাল লাগে না কি?"

একটু থেমে বল্লেন, "অন্তরে যদি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে, তারপর যা' হ'বার হউক্ না। তা'তে কি আসে যায়। দেখ বাবা, তুমি পড়বে, খুব পড়বে। তবে একটা কথা মনে রাখবে, নির্জ্জনে ভাবাও চাই। ঐ দেখ না, চাষীরা যখন বীচি পোঁতে, কত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। কত দিন ফেলে রাখে, রৌদ্রে দেয়, তারপর যখন পোঁতে, কখনও মাটির উপর ভাগেই, আবার কখনও বা গর্ত্ত করে। আবার কি আশ্চর্য্য দেখ, যখন গাছ হয়, কেউবা একবার ফসল দিয়ে শেষ হয়ে যায় যেমন ধান গাছ, আবার কেউবা বড় গাছ হয়ে অনেক বৎসর ধরে ফল দেয়। এই জন্যে বোঝা যায় না কি, যে সবাইএর জন্য এক রকম নিয়ম হতে পারে না?"

আবার বল্‌তে লাগলেন, "কিন্তু সব সময়েই মনে রাখবে বাবা, তোমার জীবন কিছু একটা আলাদা নয়। এ, যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, আর পাচ্ছ না, যা তোমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছে ও প্রকাশ পাচ্ছে না এ সমস্তই তোমার জীবন। তোমার শত্রু যে সেও তোমার বলেই তো শত্রু?

মাতাজী হাসলেন। যীশুর কথা "Love your enemy" আমার অন্তরে বেজে উঠ্‌ল ও এই মহাবাক্যের একটা নূতন অর্থ চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল কী আশ্চর্য্য ! মাতাজী কি মনের কথা বুঝেছিলেন? তিনি বল্লেন, "দেখ বাবা, গির্জ্জায় যাবে, মন্দিরে যাবে, যেখানে তাঁকে পাবে যাবে, সব তোমার, সব তুমি। কেমন, বল, নয় কি?"

আমি বল্লাম, "গোড়ার কথা আপনি যা' বলেছেন আমি ত তার সম্বন্ধে ভেবে এখনও কূল কিনারা পাচ্ছি না। যদি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকে এই কথাই ত বল্লেন? আমার শ্রদ্ধা হোল কি না সে তো ভগবান্ নিশ্চয়ই বোঝেন। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো যে আমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস হলো? কথাটা নিজের দিক্ থেকেই বুঝতে চেষ্টা করছি।"

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, ক্রমশঃ নিজেই বুঝতে পারবে। একেবারেই সমস্ত কথা বোঝা যায় না। তবে প্রথম প্রথম দেখা যায় যত বেশী ভাল লাগে, যত খানিক আনন্দ হয়, তা পাবার জন্যে, তার চেয়েও বেশী পাবার জন্যে, ইচ্ছা করে। তখনই জানবে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ঠিক হয়েছে। আর যতক্ষণ না এমনটি হবে, ততক্ষণ কি চুপ করে বসে থাকতে পারবে?"

মাতাজী বলতে লাগলেন, "কিন্তু একথা ভুলো না বাবা, তিনিই দে'ন, তিনিই পান; দেওয়া পাওয়া কী আছে তখন তাও আর জানবার থাকে না।" মাতাজী চক্ষু অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

তাইত! আমি একাই কথা বলে যাচ্ছি। ভিড়ের মধ্যে আরও কতজন হয়ত কথা বলবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন! মাতাজী নিজেই আরম্ভ করলেন, "তবে পড়াশুনার সঙ্গে ক্রিয়াও চাই। ক্রিয়া কী জান?—স্তব, স্তুতি, জপ, নির্জ্জনে চিন্তা করা।"

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। একজন স্বামিজী এসে জানালেন যে কলিকাতা হইতে একটি ভদ্রলোক এসে পৌছেছেন ও তাঁর কি যেন প্রাইভেট জরুরী কথা বলবার আছে। তখন আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, মাতাজী উঠে যাবেন কি আমরা সকলে উঠে যাব? সকলেই এক বাক্যে সাব্যস্ত করলেন যে আমরা উঠে গিয়ে কালকের সেই শামিয়ানায় অপেক্ষা করব। মাতাজী সম্মতি দিয়ে বসে রইলেন।

আমি উঠে গিয়ে স্বামিজীকে ধরলাম। বল্লাম, "চলুন আমরা কথাবার্ত্তা কই।"

স্বামিজী বল্লেন, "সে কি কথা, মা'র পর আমি কী বল্‌ব?

আমি বল্লাম, "আমিই না হয় আপনাকে বল্‌ব আর আপনি শুনবেন। চলুন ত?"

স্বামিজী খুব হেসে বল্লেন, "সে বেশ কথা।" তারপর আমরা শামিয়ানায় গিয়ে একটি নির্জ্জন প্রান্তে বসে, দু'টি অনেকদিনের পরিচিত ভাইএর মত, কত কথাই কইলাম। নদীর কূলে, আকাশের গায়ে, সে সব কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কি না, কে জানে? আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগছিল। সে সব আধ্যাত্মিক কথা নহে। মাতাজী কাশীতে, গঙ্গা বক্ষে, নৌকায় কতদিন ছিলেন, মৈনপুরী কেমন লাগল, লক্ষ্ণৌএ এখন কতদিন থাকবেন, তারপর কোথায় যাবেন, তাঁর রোজ নামচা রাখা হয় কি না, তাঁর পক্ষ থেকে কোন মাসিক পত্র বাহির হয় কি না

ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে যাহা জানলাম তা'তে মনে হোল মাতাজী এসব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। কোন কিছুরই চেষ্টা তাঁর নাই। কাল কোথায় থাকবেন তা' ঠিক করা থাকে না, উনি নিজেও বলেন না। হিন্দুস্থানী বড় ঘরের মেয়েরা এসে জমা হতে লাগলেন। সকলেই দেখ্‌লাম, ভারে ভারে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপঢৌকন নিয়ে আসছেন। দৃশ্যটি বড় ভাল লাগল।

শামিয়ানায় লোক ধরে না। এত বেশী লোক আসছে দেখে আমি একটু ব্যস্ত হলাম। স্বামিজী কী কাজে অন্যত্র গেলেন। আমিও একবার উঠে দেখ্‌লাম মাতাজী সেই দিকে আসছেন। আমি মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাতাজী বল্লেন, "কি বাবা, এখনই চল্লে?" এমনই সরল ভাবে বল্লেন যে আমার উদ্বিগ্ন মন সরল হয়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম, "না মা, আজ গায়ের কাপড় এনেছি। আজ খানিকক্ষণ বস্‌ব। তবে দেখুন, আমার মা আপনার কাছে আসতে চেয়েছেন, কাল সকালের দিকে আপনার কাছে আন্‌ব।

মাতাজী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শামিয়ানায় গিয়ে মহিলাদের কাছটিতে মাতাজী বসলেন। একটু তফাতে পুরুষরা সব বসলেন। আমি পুরুষ ও মেয়েদের মাঝামাঝি, সব পেছনে বসলাম। তবে ঠিক আমার সম্মুখেই আর এক প্রান্তে বিশিষ্ট আসনে সমতল ভূমিতে সকলের সঙ্গে আসীনা মাতাজী সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে রইলেন। যোশীজী আলো জ্বেলে উচ্চৈঃস্বরে প্রণাম জানিয়ে, তাঁর পরিচিত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় চীৎকার করে মাতাজীকে জানাতে লাগলেন। এ সব কথা বলা বাহুল্য। কারণ আমার মনের মধ্যে মাতাজীর কথাগুলিই বেশী করে বাজছিল, আর সব ভাল লাগছিল কিন্তু মনের মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছিল না। লোকেদের আসা যাওয়া,

মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি, দু'একজন মাতাজীর অনুগত ব্যক্তির মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে আদেশ চাওয়া কিছুই আমার অন্তরে প্রবেশ করছিল না। আমার মনের দরজা কতকটা খোলা ছিল বটে, কিন্তু নিভৃতে আমি তখনও বোধ হয় আমার মনের ভিতরকার মাতাজীর সহিত কথা কইছি কিংবা আরও শোনবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ দেখ্‌লাম, সবই চুপচাপ। সন্ধ্যা নেমে আসছে। মাতাজীর মাথা দুলচে। জগতের খবর আমি তখন জানি না। মাতাজীর চোখদুটি কি একটুখানিক বুজে গেল? কিংবা হয়ত আমার দেখ্‌তে ভুল হোল। জগতের মাতা যিনি তিনিও কি সন্ধ্যার আগমনে একটুখানিক চক্ষু মুদ্রিত করে নিলেন? মাতা শিশুকে ঘুম পাড়াবার পূর্ব্বে কি নিজেও একটুখানিক ঘুমিয়ে পড়েন? আমার চোখে কিন্তু ঘুম আসে নাই। মাতাজীও চক্ষু মেলিলেন। সবাই চুপচাপ দেখে আমাকেই আরম্ভ করতে হোল। আমি বল্লাম, "মাতাজী, আচ্ছা, ধর্ম্মজীবনের জন্য ঘুমটা ভাল কি? অবশ্য আমি কিছু না ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

মাতাজী বল্লেন, "তা বেশ করেছ বাবা। দেখ বাবা, ঘুম সবইএর পক্ষে সমান ত হয় না, শিশুরা কত বেশী ঘুমায়, তারপর বয়স হতে হতে ঘুম যায় ও বৃদ্ধদের অনেকের দেখ্‌তে পাওয়া যায় ঘুম হতেই চায় না, ঘুমের জন্য সাধনা করতে হয়। যার যেমন দরকার তার তেমনই ঘুম হওয়া চাই ত?"

আমি সম্মতি জানিয়ে বল্লাম, " কিন্তু ধর্ম্ম সাধনকালে ঘুমের প্রয়োজন নাই বলে ধরব কি?"

মাতাজী বল্লেন, "তা ধরবে কেন বাবা? এইত বলা হোল সব লোকের কথা ত একরকম হতে পারে না। পারে কি?"

আমি বল্লাম, "মাতাজী ঘুমের মধ্যে যে সুষুপ্তি আছে তা কি কল্যাণপ্রদ?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ সে ত বেশ অবস্থা। কিন্তু জেগে থাকা আরও ভালও অবস্থা নহে কি?"

আমি বল্লাম, "জাগ্রত অবস্থায়ও সুষুপ্তি হয় ত?"

মাতাজী বল্লেনম, "হয় বৈকি, দেখ বাবা, জাগ্রত-সুষুপ্তি ঘুমন্ত অবস্থার সুষুপ্তির চেয়ে অনেক ভাল।"

কথাটা কেহ কেহ আবার শুনতে চাওয়ায় মাতাজী আবার বল্লেন। তারপর বল্লেন, "এইত আসছে বাবা যে জাগ্রত সুষুপ্তির কাছে ঘুমানো সুষুপ্তির মূল্য অর্দ্ধেক। তা'হলে জেগে থেকে সুষুপ্তিতে থাকাই বেশী ভাল নহে কি?"

কাছে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি ভদ্র মহিলা অস্ফুটস্বরে বল্লেন, "আপনি ত স্বপ্নের কথা কিছু বল্লেন না। আমার কিন্তু স্বপ্ন বড় ভাল লাগে। আমি স্বপ্নে প্রায়ই কালী ঠাকুর, শিব ঠাকুর, সব দেখি। খুব ভাল লাগে। কিন্তু এ'ও দেখেছি যে রাত্রে শোবার সময় কিছু না ভেবে শুই সে রাত্র তো দেখ্‌তে পাইনা।"

মাতাজী বল্লেন, "তুমি ঠাকুর দেবতাদের স্বপ্নে দেখ্‌তে পাও? সে ত খুব ভাল কথা। অন্য কিছু দেখবার চেয়ে ঠাকুর দেবতা দেখলে বেশী আনন্দ হয় না?" তারপর সমস্ত তাঁবুটা নিরীক্ষণ করে, একটা যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমাদের বুদ্ধির গোচরে আনবার জন্য বল্লেন, "কিন্তু স্বপ্ন ত স্বপ্নই বটে। স্বপ্ন তো ভেঙ্গে যায়, ভেঙ্গে যায় না কি? তারপর এই যে সবটা, এও ত একটা স্বপ্ন। এও ত ভেঙ্গে যাবে?"

কথাটা শুনেই আমার চমক লাগল, আমি বল্লাম, "মাতাজী,

তবে কি এক সময় জেগে উঠে দেখ্‌ব, আর এক যায়গায় জেগে উঠলাম, আর এ সমস্ত বৈচিত্র স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে।"

মাতাজী বল্লেন, "বাবা, সেতো হবেই। এ স্বপ্ন ত একদিন ভাঙ্গ বেই। এর চেয়ে বড় একটা বৈচিত্রের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গবে। আচ্ছা তুমিই বল, এ জীবনেই কি ঠিক এমনতর হয় না?"

মাতাজী আবার আমাকে কোথা থেকে টেনে এনে সেই তাঁবুতে তাঁর কোলের কাছটিতে বসালেন। হঠাৎ ভূত দেখ্‌লে শিশু যেমন মায়ের বুকের মধ্যে আরও কাছে গিয়ে জুড়াতে চায় আমিও সেই মত অদৃশ্যময়ী মাতাজীকে বুকের মধ্যে রেখে সামনে প্রতিমূর্ত্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিশেহারা হয়ে গিয়ে আবার আত্মহারা হয়ে গেলাম।

সবাই কিন্তু চুপচাপ। আমার বড় ঈর্ষা বোধ হোল। এরা সবাই নিশ্চয়ই আমার চেয়ে আরও অনেক কাছে, মাতাজীর কাছে, পৌছে গেছে। তাই কথা নাই। আর আমার ও মাতাজীর মধ্যে কথার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। যেন ওপারে একজন আর এপারে আর একজন। তবু চুপ করে থাকতে পারলামনা। বল্লাম, "মাতাজী, তখন আপনি যে ক্রিয়ার কথা বলছিলেন, তাতো শেষ হতে পেল না। ক্রিয়া কি রকম করা চাই, আর একটু বলুন।"

বলতে ভুলে গিয়েছি সভায় বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানী পুরুষ ও রমণী উপস্থিত থাকায় মাতাজীর অনুরক্ত কয়েজন ভক্ত বলেছিলেন, "হিন্দীতেই কথাবার্ত্তা হউক্।" সেই জন্য মাতাজী প্রায় সব সময়েই উত্তর হিন্দীতেই দিচ্ছিলেন। ভাঙ্গাচোরা ভাষাঠিক জোড়া লাগছে না এই রকম একটা অনুমান করে মাতাজী একবার বল্লেন, "কি করি বাবা, এ শরীরে টুটা ফুটা হিন্দী আসে যেমন পাখীরা উচ্চারণ করে।" সকলেই বলে উঠ্‌লেন, "না মাতাজী, আমাদের বেশ ভাল লাগছে।"

ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। শামিয়ানা জোড়া দিয়া অনেকখানি স্থান করা হয়েছিল। এক্ষণে লোকেরা পশ্চাতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলেন ও মাতাজীকে দর্শন করবার জন্য অনেকে পিছনে থেকে সাগ্রহে ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনেক কষ্টে মাতাজীর মুখখানি কতক দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন। সেই কারণই বোধ করি প্রস্তার উঠ্‌ল যে মাতাজী একটু উচ্চে একটা কৌচে বস্‌লে ভাল হয়। একখানি সোফা চারজন মিলে যথাক্রমে বয়ে আনলেন। মাতাজী চুপ করে দেখছিলেন। কিন্তু তাঁকে ব্যবস্থাটা জানাতেই তিনি এমন নীরবে "না" করে দিলেন যে সকল যুক্তি তর্ক পরাস্ত স্বীকার করল। মাতাজী সকলের সঙ্গে সমতলভূমিতে বসে রইলেন, তাঁকে একটুও বিচলিত করতে কেহই পারল না। অথচ কারও মনে কষ্টও হোল না। পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যেন মাতাজীর প্রকৃত স্বরূপ আরও বেশী করে দেখ্‌তে পেলেন। ও সেই জন্যই বোধ করি বলে উঠ্‌লেন, "না, মাতাজী, আপনি যেখানে বসে আছেন, ঐখানেই থাকুন, আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি।"

মাতাজী কিন্তু একটুখানিক উদ্বিগ্ন হয়ে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের জন্য যাহাতে বসবার স্থান হয় তাই তাঁহার কাছে যে সব মহিলারা বসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে নিকটতম এক বৃদ্ধাকে হাত দিয়ে জাপটে ধরে বল্লেন, "মা, তুমি, তোমরা সবাই, মেয়ের কাছে, আরও কাছে, সরে এসে বসো না!" বৃদ্ধা, মাতাজীর আসনের খানিকটা অংশে পৌঁছে গেলেন ও মাতাজী সতরঞ্চির দিকে নেমে যাচ্ছিলেন। কেহ কেহ বলে উঠ্‌লেন, "মাতাজীর আসনে কিন্তু মাতাজীর বসা চাই।" বৃদ্ধা সম্ভ্রমে সে অনুযোগ স্বীকার করে নিলেন। মাতাজী বল্লেন, "বাবা, মেয়ের আবার মায়ের কাছে আলাদা হওয়া কি? উঁচু নীচু স্থান কি? সবাই এত

যখন কাছাকাছি মিলে মিশে থাকা তখন সেই ভাবটা বেশী করে মনে রাখ্‌লে ভাল হয় না কি?"

আমি কথাটাকে ফেরাবার জন্য বল্লাম, "মাতাজী, আপনি ক্রিয়ার কথা বলছিলেন। আর কি বল্‌বেন না?"

আবার মাতাজী আরম্ভ করলেন। যাহা বলছিলেন তাই আবার কতকটা পুনরাবৃত্তি করে বলতে লাগলেন, "দেখ বাবা, মন্ত্র, জপ, তপ, পূজা, অধ্যয়ন, সবই ভাল। সবই দরকার। যার যতটা উপকারে লাগে। তবে দেখ, প্রথমে এ সব ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। ক্রমশঃ দেখা যায় সবই এক রকম হয়ে যায়। স্কুলে যখন ছেলে ভর্ত্তি হয়, কতগুলো বিষয় পড়ে। ক্রমশঃ বিষয়গুলো বেড়ে গিয়ে কমে যায়, আবার বদলেও যায়। পরে কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হয়, কেউ বা প্রফেসার হয়, কিন্তু আবার সেই একটা বিষয় ধরেই অন্য কত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এ বের মধ্যে নানা পথ হয়ে যায় যেমন নানা থেকে একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনই ধর্ম্ম সাধনার মধ্যেও নানা পথের উদয় হয়, আবার সব মিলে যায়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, কোনটাই, বাবা, পৃথক নয়। ভক্তি না থাকলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না থাকলে কর্ম্ম করা যায় না। আবার কর্ম্ম জ্ঞানকে শুদ্ধতর করে, ভক্তিও তো সঙ্গ ছাড়ে না। কখন যে কোন্‌টা নজরে থাকে, আর কোন্‌টা থাকে না, সে কথা সাধক নিজেই ভুলে যা'ন। তবে এ নিয়ে তো গোল করা ঠিক নয়। ঠিক কি? তাই হয় বাবা, কোন পথ, কোন ক্রিয়াই ফেলবার নয়। যেটা তোমার অনুকুল মনে হয়, সেইটা ধরেই চল, বাকিগুলো কেউই প্রতিকূল হবেনা। তুমি কেন প্রতিকূল হবে বাবা? সব দিয়ে সেই সবকে, সব যিনি, তিনিই ত ধরে রয়েছেন। যদি ছাড়েন বলো, সেও ত তাঁর ধরাই। তাঁর কাছে ছাড়া আর ধরা, কি আছে বল দেখি?"

একটু চুপ থেকে আমি বল্লাম, "মাতাজী, আপনি স্কুলের উদাহরণ দিলেন। স্কুলে যখন যাই, বাবা নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দে'ন, মাষ্টার মশায় পথ বলে দে'ন। সাধনার পথেও কি তা'হলে গুরু না হলে চলবে না?" মাতাজী বল্লেন, "তা'ত সত্যি, বাবা, গুরু চাই বৈ কি। সামান্য লেখাপড়ার জন্য গুরু যখন দরকার হয়, ধর্ম্ম সাধনায় গুরু দরকার হবে না?"

আমি বল্লাম, "মাতাজী তা'ত বুঝলাম। তবে গুরু পাওয়া কি করে যাবে? পৃথিবীর স্কুল কলেজের ছাত্রেরা তা গুরুর অন্বেষণ করে নেয়, আবার ভূলও করে। যাক্ সে কথা। ধর্ম্ম-জীবনেও কি ঐ একই পথ? শিষ্যকে কি গুরু-অন্বেষণ করতে হবে? না, গুরু যিনি তিনি শিষ্যকে খুঁজে নেবেন?"

কথাটা হয়ত আমার বলা উচিত ছিল না। কিন্তু আমি ত কোন বিশেষ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বলিনি। জানতে চেয়েছিলাম, সাধন জীবনের নিয়মটি কী? মাতাজীও রুষ্ট হলেন না। আনন্দময়ী মা যদি রুষ্ট হ'ন তা'হলে তাঁর নামের সার্থকতা কোথায়?

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, ঐ দুরকমই হয় অথবা এও বলা যায় যে দু'জনা দুজনকেই খোঁজেন। কারণ আসলে সেই একজনাই একজনকে পান কি না। পান না কি? তবে কথা হচ্ছে দু'জনের ভিতরেই সেই এক ইচ্ছাই কাজ করে, সেই একই ইচ্ছা সব ঘটাচ্ছে বাবা। তুমিই বল?

আমি নিজের অন্তরে খুঁজতে চেষ্টা করলাম। কথা ত অনেক কইলাম। মাতাজীর উত্তরগুলি প্রাণের উপর পরশ বুলিয়ে গেল। যেটুকু জ্ঞান পাওয়া গেল সেটুকু পৃথক করে নিবেদন করে আলগোচে জানাব

এমন উপায় নাই। মাতাজীর উত্তরগুলি তাঁর জীবনের এত ঘনিষ্টভাগ বলে মনে হতে লাগ্‌ল যে তাঁকে ও তাঁর কথাগুলিকে অভিন্ন বলে মনে হতে লাগল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম , তিনি যা' উত্তর দে'ন, তার ভাষা এত সরল, ভাব এত সুস্পষ্ট, যে তা' শুনতে বা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর বলবার ভঙ্গিতে যেন সমস্ত উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রয়েছেন। সেই ভঙ্গিটুকু মর্ম্ম স্পর্শ করে বুঝিয়ে দেয় যা' কথায় অব্যক্ত থেকে যায়। তাঁর সব কথা শুনে মন সায় দিয়ে ওঠে যে বুঝেছি। কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি বুঝেছ? তার উত্তরে নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় নাই। যেমন পেট ভরেছে কি না, তার উত্তরে বলা যায় "হাঁ ভরেছে।" কিন্তু কি খেয়ে ভরেছে, তার আস্বাদ কেমন লাগল তা' যে খায় নাই তাহাকে বোঝান যায় না। আর যে খেয়েছে তাকে বোঝাবার দরকার হয় না।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নদীর ক্ষুদ্র কায়াটুকু ছায়াপথের ভিতর দিয়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। পথ চলে গেছে। তার শেষ কোথায় তা' পথই বলে দিতে পারে। মাতাজী কি ক্লান্ত বোধ করেন না? শুনেছি সকাল থেকে লোকের ভিড় থাকে। সবাই কত কথা জিজ্ঞাসা করে। সত্যি, এবার আমার চুপ করা উচিত। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এত কাছে বসে চুপ করে থাকব কেমন করে? মনে মনে স্থির করলাম মাতাজীর কাছে আজ আমার বিদায় লওয়াই ভাল। দূর থেকেই একটা যেমন করে হউক্ প্রণাম জানালাম। মাতাজী বল্লেন, "ঠাণ্ডা লাগবে বাবা? এইবার যাবে বুঝি?"

আমি বল্লাম, "হাঁ মাতাজী, কাল আবার দেখা হবে।"

মাতাজী উত্তর দিলেন না। কান পেতে রইলাম। তিনি আদেশ দিলেন, "এইবার কীর্ত্তন হউক্।"

কীর্ত্তনের ব্যবস্থা বোধ করি পূর্ব্বে থেকেই ছিল। তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হতেই চলে আসা আমার ভাল লাগ্‌ল না। শামিয়ানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রইলাম, খানিকক্ষণ শুনতে লাগলাম। মাতাজীর আর যেন স্পর্শ পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। সাবাই গাইছেন "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।" আর মাতাজীর স্বরূপটি কোন উদ্দেশবিহীন অসীমের পারাবারে মগ্ন হয়ে পড়ছে তা' সেই স্তিমিত আলোকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমার অনুভূতির বাহিরে ছিল না। আমি বুঝলাম, মাতাজী ডুবে গেছেন। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে যেতে পারলাম না। কীর্ত্তনের কথাগুলো আমার শরীরকে যেন কাঁটার মত বিদ্ধ করতে লাগল। অযোধ্যা প্রদেশের পুণ্যভূমিতে রাজা রামের কীর্ত্তনের মধ্যে রাজরাজেশ্বরীকে ডুবতে দেখে আমি অন্ধকার পথে পা বাড়ালাম।

আকাশের চাঁদ আকাশে, নদীর জল নদীতে। আমার মন সুরের সঙ্গে ভেসে ভেসে একটি স্বরূপের অন্বেষণে উদাস হয়ে চলে গেল। ঘরে ফিরলাম বটে, কিন্তু মন আর ফিরল না।

(৩)

মাতাজীর দরবারে সকালবেলা

পরের দিন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) সাকাল বেলা। বেলা প্রায় দশটা হবে। আমার মাতা ঠাকুরাণীর প্রস্তুতির বিলম্ব হওয়ায় তাঁকে নিয়ে মাতাজীর কাছে পৌছাতে দেরী হয়ে গেল। মাতাজীর নিকট পৌঁছে দেখ্‌লাম, অনেকগুলি ভদ্রমহিলা তাঁকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। হাসিমুখে অভিবাদন করলেন। কি যেন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। আমি আমার অন্তরে

আবহাওয়ার মাপকাঠির স্পর্শ নিতে ব্যস্ত ছিলাম। মনে হোল মাতাজী যেন অন্তঃপুরে বসে আছেন। সে যে কোথাকার অন্তঃপুর তাই খুঁজতে লাগলাম। মহিলাদিগের মধ্যে বাঙালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী সব রকমই ছিলেন। মাতাজীকে বাঙলা কিংবা হিন্দীতে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। তিনি হিন্দীতে কখনও বাঙলাতে উত্তর দিচ্ছিলেন। বাঙলায় বলে আবার হিন্দীতে তার পুনরুক্তি করছিলেন। সেই হেতু সকলেই বুঝতে পারছিলেন। আমার মত কয়েকটি পুরুষও যাঁরা এসে পড়েছিলেন পিছনে ছিলেন।

অন্তঃপুরীকাগণের চিন্তার একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য করলাম। প্রায় সকলেই মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে চা'ন। মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে জন্ম হয় কি না ইত্যাদি। একজন বলিলেন, "মা, মৃত্যুর পরে মানুষ থাকে কি?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, থাকে বৈকি। এই যেমন গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ হয়। সেই রকমই মানুষ মরলে পরে বীজের মত জন্ম মৃত্যু এইভাবে চলতে থাকে।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, মৃত্যুর পরেই কি জন্ম হয়? সময় লাগে না?

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, সময় লাগে, আবার লাগেও না। এই যেমন তোমরা এসেছো, আবার বাড়ী যাবে। পথে কোথাও দাঁড়িয়ে যেতে পারো, আবার সোজা চলেও যেতে পারো।"

একটি যুবক পিছন থেকে বল্লেন, "আত্মা ত একটাই। তবে এতজনের আলাদা অবস্থা হয় কেমন করে?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, আত্মা এক বটে। কিন্তু জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন

পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় ও সেই সকল বিশিষ্ট আধারের জলের ভিন্ন ভিন্ন রূপ গতি হয় , যতক্ষণ না সেই নির্দ্দিষ্ট জল সমগ্র জলে মিশে যায়, কতকটা সেই মত। পরমেশ্বরকে পেলে পর জন্ম মৃত্যুর কথাই উঠে না। যতক্ষণ না বস্তুর জ্ঞান নিজ সত্তার মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ হয় ততক্ষণ আসা যাওয়া থাকেই।"

একটু থেমে বল্লেন, "আর সেই এক বস্তুর সঙ্গে মেলবার জন্যই ত এই আসা যাওয়া। সেটা হলে ত এসব প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। দেখ, স্বভাবের মধ্যেও তাই ত গতি। নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কূপের জল কিংবা বৃষ্টির জল সব একত্র হবার জন্যই চলেছে। সেই একের মধ্যে সব বিভিন্ন রূপ ধারণ করে রয়েছে। একের মধ্যে ভিন্নতা। এই ভিন্ন ভাবের মধ্যেই সব একের দিকে চলেছে। আবার একের মধ্যেই সব ভিন্ন হয়ে রয়েছে। আবার আমাদের যখন মনে হচ্ছে ভিন্ন তখন তারা অন্তরে একই আছে। আবার যখন তারা একই রয়েছে তখন ভিন্নতার ভাব ছাড়তে পারছে না। এই দুইটি ভাবই যে তাঁরই মধ্যে রয়েছে। একে ভিন্নতা ও ভিন্নতায় এক।"

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "তা'হলে কিসের দ্বারা মৃত্যুর পরে জন্ম নির্দ্ধারিত হবে?"

মাতাজী বল্লেন, "কর্ম্মের দ্বারা। যে যেমন করেছে সেই ভাবই ত তার সঙ্গে ইচ্ছারূপে থাকে। এই জন্যই ত এ জীবনে যত পারবে ঈশ্বরের দিকে চেয়ে থাকবে। তাঁরই কথা ভাববে। তা'হলে পর সেই মত ইচ্ছা, সেইরূপ কর্ম্মের ফল সঙ্গে যাবে। তা'তে তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার অভিষ্ট দেবতার ইচ্ছা মতই, তোমার জন্ম হবে। হবে কি না? তা'ও তুমিই যখন ইচ্ছা করবে। তাই তোমার ইচ্ছা মতই কাজ হবে। তবে সে জন্ম আরও তোমার পক্ষে ভাল হবে। কারণ তুমি নিজেই ত চাইবে যে তোমার ইচ্ছা দিয়ে নয় বরং তাঁর ইচ্ছা দিয়ে তোমার পরজন্ম স্থির হোক্। তাঁর ইচ্ছা আরও বেশী করে তোমার ইচ্ছায় ও তোমার ইচ্ছা বেশী করে তাঁর ইচ্ছায় পরিণত হলে তুমি এগুচ্ছ কি না? মূলতঃ তোমার ইচ্ছা ও তাঁর ইচ্ছা ত ভিন্ন নয়। ভিন্ন কি?"

মহিলাগণ চুপ করে শুনছিলেন। মাতাজী আবার বলতে লাগলেন, "মনে হয় বটে পৃথক। তাই ত অবিরাম এইরূপ ইচ্ছা করতে হয়— সেই একের মধ্যে ডুবে যাই। তখন জন্ম মৃত্যু থাকুক না থাকুক, এ প্রশ্নই আর অন্তরে থাকে না। আসলে এ প্রশ্ন ততক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আলাদা আলাদা ভাব থাকে। এই ভাবটি কেটে যাবে না, অথচ মৃত্যুর পর জন্ম হবে না, এমনতর কি করে হবে?"

একজন প্রশ্ন করলেন, "তা'হলে পরমেশ্বরের সাথে মিশে গেলে পর আর ত জন্ম হয় না?"

মাতাজী বল্লেন, "সে প্রশ্ন তখন আর উঠে না। দেখ, তোমার জীবন তখন তোমার এই ক্ষুদ্র জীবন থাকে না। যা' দেখ্‌ছ, যা' দেখ্‌ছ না, যা' রয়েছে, যা' থাকবে, যা' ছিল, তোমার শিশুত্ব, তোমার বৃদ্ধত্ব, তোমার আগের, তোমার পরের যা' কিছু সব মিলে এক অখণ্ড জীবন তখন তোমার জীবন বলে বুঝতে পারবে। কাজেই কার জন্ম, কার মৃত্যু, এসব কিছুই তখন থাকবে না।"

একজন প্রশ্ন করলেন, "কি করে এই অবস্থায় পৌছাতে হয়?"

মাতাজী বল্লেন, "এই ত বল্লাম, অভ্যাস করে যাও। সব সময়েই, সকল অবস্থায় তাঁকে মনে করে চলতে হবে, যেন একটি শ্বাসও ব্যর্থ না যায়। তাঁর কথা বল্‌বে, তাঁর কথা চিন্তা করবে, তাঁর কাজ করবে, লক্ষ্য তাঁর দিকে থাকা চাই। কি করছ, কি ভাবছ, কি বল্‌ছ, তা'তে মন

থেকেও থাকবে না। অথচ না থেকেও থাকবে। কারণ তিনি যখন অন্তর জুড়ে থাকবেন তখন কোন দিকেই কোন ভয় বা চিন্তা নাই।"

একজন তরুণী বল্লেন, "মা, মনটাকে স্থির করতে পারি না। এ'র কি উপায় হবে?"

মাতাজী বল্লেন, "অস্থির মনই ত এ'র উপায় করে দে'বে। অস্থিরতা থেকেই ত স্থিরতা হবে। আবার স্থিরতা থেকে অস্থিরতা জন্মাবে। এ সবই সেই একেরই খেলা, যত বুঝবে তত মন আরও স্থির হবে। আবার অস্থিরতাও বাড়বে। তবে সুবিধা হবে এই যে এখন তুমি যেমন চাইবে সেই রকমটি হবে না, ক্রমশঃ তিনি যেমন চাইবেন সেই মত হবে। তারপর যা' হবে তা'ত বলা হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা মূলতঃ এক যে, তাই এক তিনি তোমার অন্তরে উদয় হবেন। কোথায় বা থাকবে তুমি। তোমার থাকা না থাকা তোমার কাছে সমান হয়ে যাবে না কি? অথবা যখন তুমি থাকবে মনে হবে, না তো, তিনিই আছেন। আবার যখন তুমি থাকবে না, ভয় হবে না, মনে হবে, তিনি ত রয়েছেন। অথবা এমনও হতে পারে, যখন তিনি আছেন তখন তুমি সত্তার উপলব্ধিতে ডুবে গিয়ে আত্মহারা হয়ে যাবে। আবার যখন আশঙ্কা হবে যে তিনি নাই, তখনই বুঝতে পারবে যে তুমিও নেই ও তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে অন্তরে ঠিক ধরে নিতে পারবে যে তিনি তুমি ও তুমি তিনি হয়ে আছ। এখন যেমন তোমার উপর তাঁর অস্তিত্ব, তখন সেই মত তোমার অস্তিত্ব তাঁর জানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ও সেই পরম দেবতা বিরাজ করবেন তোমার সকল সত্তা জুড়ে।"

মাতাজীর কথাগুলি যেমন যতটুকু বুঝেছিলাম ও মনে রাখতে পেরেছি তাহাই লিপিবদ্ধ করলাম। তাঁর উত্তরগুলি সকলের জন্য একটি

উক্তিতে পর্য্যবসিত করতে হলে অনেক প্রকার বিভিন্ন অবস্থার সমাবেশ একসঙ্গে করতে হয়। তা' শুধু তাঁর অলৌকিক শক্তিতেই সম্ভব।

একজন বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করলে মৃত ব্যক্তির সদ্‌গতি হয় কি?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, তা' হয়। শীঘ্র তার জন্ম হয়ে যায়।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী , মৃত্যুর পরই যখন মানুষ কোথাও চলে যায়, সেই ত তার বলতে গেলে একটা জন্ম হয়ে গেল। তা'হলে আবার জন্মের কথা কেন?"

মাতাজী বল্লেন, "তার অবস্থা আরও অনুকুল হয় বলে আর একটা ভিন্ন জন্মের কথা বলা হোল।"

একজন পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ লোক বলেছিলেন, "এই সব শ্রাদ্ধাদিতে যদি কাহারও বিশ্বাস না থাকে তা হলেও কি তাহার পক্ষে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করা উচিত?"

মাতাজী বলেছিলেন, "বাবা, অবিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে লাভ কি?"

বৃদ্ধ লোকটি বলেছিলেন, "শাস্ত্রাদি ত কালের ধর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রাদি ফলবে না কি?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, তা'ও ঠিক। আবার এও ত বলা যায় যে সমস্ত কাল ত তাঁকে নিয়েই। আর তিনিই ত সব শাস্ত্রের পশ্চাতে? কাজেই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে কি আসে যায়? যদি ঠিক মত, শাস্ত্র অনুযায়ী কাজ হয়, সেইটাই ভাল নয় কি? আর যে মানুষ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস করেনা তার সংস্কারও তো সেই শাস্ত্রের কার্য্য অনুসারেই তৈরী হয়েছে?"

তারপর বল্লেন, "সংস্কারের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে। সেই সংস্কারের দ্বার দিয়েই ত সে মানুষটি শাস্ত্রের বোঝাপড়া করবে। সব চেয়ে ভাল

কথা হচ্ছে যে দিকে যে ভাবে বিশ্বাস আছে, সেই দিকে সেই ভাবে ক্রিয়া করবে। কোনটাতে অবিশ্বাস তা' খোঁজ করবার দরকার কি?"

একটু থেমে বল্লেন, "নিয়ে তো তিনিই যাচ্ছেন বাবা। আমার অবিশ্বাস দিয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাস হারার কেন? যেখানে বিশ্বাস আছে, সেইখান থেকেই এগিয়ে চল না বাবা। সব সংস্কারের পারে সকল শাস্ত্র এক হয়ে রয়েছে। তোমার বিশ্বাসের আগুন তোমাকে দেখিয়ে দেবে, এখানে আগুন জ্বলছে, ওখানে আগুন জ্বলছে, তোমার বুকের মধ্যেও আগুন জ্বলছে: সবই ত আগুন। সবই ত সেই একই। সেই একের শরণাপন্ন হও।"

"যুক্তি কর, কিন্তু অহঙ্কারের জন্য নয়। শুধু তর্ক করেও লাভ নাই। সত্যকে ধরা অল্প কথা নহে। আবার অল্পও বটে, যখন সত্য ধরা দে'ন। বিশ্বাসের পথে সরলভাবে এগিয়ে যাও। মিছে সময় নষ্ট করে কাজ কি? তোমার জ্ঞান মত, তোমার বিশ্বাস মত, তুমি এগিয়ে যাও। অবিশ্বাসের কথা কিংবা অপরের বিশ্বাসের কথা নিয়ে তোমার কি হবে বাবা? তখন জ্ঞান ও বাড়তে থাকবে। তোমারও পরিবর্ত্তন হতে থাকবে। সে যে কত বড় পরিবর্ত্তন তা কথায় বুঝান যায় না।"

একটি মহিলা অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিনয়ের সহিত প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, মানুষ মরে যাবার পরে মানুষ ছাড়া আর কোনরূপে তার জন্ম হওয়া কি সম্ভব?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, সম্ভব। যেমন মন থাকবে, সেই মত হবে। পশু হতে পারে, গাছ হতে পারে। পাথরও হতে পারে।"

আমি বল্লাম, "আমি ত তাহলে বৃক্ষ হতে চাইব। বেশ কোন নড়া চড়া নেই। ফুল ফল পাতা যার যা' ইচ্ছে নিয়ে যাবে। আমার সেই ভাল হবে।"

একজন স্বামিজী দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। তিনি বল্লেন, "তার চেয়ে ত ভাল পাথর হওয়া।"

মাতাজী হেসে বল্লেন, "হাঁ, তা'হলে ভোগ পাবে, শিব বলে লোক পূজা করতে পারে।"

সকলেই হাসতে লাগলেন।

একটি যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "মাতাজী, মনের অবস্থা কি খাওয়ার উপর নির্ভর করে? খাওয়ার কিরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক?"

মাতাজী বল্লেন, "সে ত তোমার মনই বলে দেবে। কি খেলে তুমি ভাল থাকো তুমি নিজেই বিচার করতে করতে অগ্রসর হবে। এই বিচার তুমি ছাড়বে না।

তারপর এক নিঃশ্বাসে বোধ করি তাহার সাহায্যের জন্য তাহার ব্যক্তিগত অবস্থা বুঝিয়া তাহার কল্যাণের জন্য বল্লেন, "মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, লসুন ইত্যাদি ভাল জিনিস নয়। তোমার তাই মনে হয় না কি? তবে যদি না খেয়ে থাকতে না পারো, তাহলে ধর, আজ খেলে, কাল আর খেলে না, আবার পরসু না হয় খেলে। এই রকম করে একবার খেয়ে আর একবার খেতে দেরী লাগাবে। ক্রমশঃ আরও দেরী। অভ্যাস তোমায় সাহায্য করবে। আর খেতে ইচ্ছা কমে যেতে থাকবে। তোমার শরীরও চাইবে না। তা'তে উপকার হবে।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী, খাওয়াটা অনেক সময়ে আমাদের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। বাড়ীতে মায়েদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তখন উপায় কি। কার ইচ্ছামত কাজ হবে?"

মাতাজী হেসে বল্লেন, "দেখ, কার ইচ্ছা অনুযায়ী হওয়া তুমি চাও? তোমার না তোমার মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী?"

আমি বল্লাম, "সেই ত আমার সমস্যা। কখনও বা আমার নিজের

ইচ্ছা মত ঠিক করতে ইচ্ছা হয়। কখনও ব তাঁর ইচ্ছায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে। যদি একজনের ইচ্ছার উপর খাওয়ার ব্যবস্থা নির্ভর করত তা'হলে ত এই সঙ্কট উপস্থিত হোত না। আমি হয়ত মাছ খেতে চাই না, মা বল্লেন, খেতেই হবে।"

মাতাজী বল্লেন, "বেশ ত, তবে তাই চলুক না কেন। তা'তেও উপকার হবে। মন তৈরী হবে। তা'তেও কল্যাণ। ক্রমশঃ ভালই হবে।"

একটি মহিলা আবার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, "মা, মন চঞ্চল হলে কি করব?"

মাতাজী আবার পূর্ব্বের কথাই অন্যভাবে বল্লেন।

আমি বল্লাম, "মন যখন একবার এক দিকে, আর একবার অন্য দিকে যায়, তখন যদি গান গাওয়া যায় তা'হলে কি ভাল হয়? না, তার মধ্যেও মন্দ ফল আছে?"

মাতাজী বল্লেন, "না, সে ত খুবই ভাল। তাতে মন্দ ফল কিছু হবে না। যদি ঈশ্বরের দিকে মন থাকে, মন্দ হতেই পারে না। তাঁর দিকে মন থাকলে মন্দ আসতেই পারে না। আগেও নয়, পরেও নয়।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী, ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু কতটুকুই বা জানি বা বুঝি। তারই মধ্যে যদি আলোচনা করা যায় তা হলে কি ভাল হয়?"

মাতাজী বল্লেন, "নিশ্চয়ই।"

আমি বল্লাম, "ধরুন, বিশ বৎসর পরে জানলাম যে আমি যাহা বলেছিলাম বা লিখেছিলাম তার মধ্যে ভুল রয়ে গেছে।"

মাতাজী বল্লেন, "তা'তে কিছু যায় আসে না। তুমি ত নিজে ভেবে চিন্তে কিছু করো নি। ঈশ্বরকে সামনে রেখে বলেছিলে, লিখেছিলে। তার ফল ঈশ্বর ভালই করবেন। যদি কোন মন্দের আশঙ্কা তোমার হয়, ঈশ্বরের জগতের ভার তিনি নিজেই চালাচ্ছেন। আর সব ত কিছু পৃথক নয়। সবই ত তিনি।"

বেলা বেড়ে গেল। মাতাজীর অনুগত জন তাঁর সেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। এইখানেই সকালবেলার দরবার ভঙ্গ হোল।

(৪)

মাতাজীর দরবারে বৈকালবেলা

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, বৈকালবেলা। মাতাজী তাঁর ছোট তাঁবুতে বসে আছেন। সংলগ্ন শামিয়ানায় আর সবাই। তাঁর কাছে, খুব কাছে, মহিলারা। বৈকালের রৌদ্রটুকু তাঁর তাঁবুর মধ্যে এসে পড়েছে। গোমতী নদীর জলের দৃশ্যটি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে হলেও অনুভূতির বাহিরে নহে।

আমি বল্লাম, "মাতাজী, শুনলাম, এখানে আসবার কিছু দিন আগে আপনি কাশীতে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় কিছুদিন ছিলেন। এখন ত গোমতীর ধারে রয়েছেন। কোন্‌টা বেশী ভাল লাগে? গঙ্গা না গোমতী?"

মাতাজী চক্ষু মুদ্রিত করে একটুক্ষণের জন্য কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু তৎক্ষনাৎ ফিরে এসে হাসতে হাসতে গোমতীর পানে চেয়ে বল্লেন, "এও ভাল, সেও ভাল। বুঝলে বাবা? গোমতীও ভাল, গঙ্গাও ভাল।"

আমি বল্লাম, "তা' জিজ্ঞাসা করছি না মাতাজী, কোন্‌টা বেশী ভাল?"

মাতাজী বল্লেন, "এখানে এখন গোমতী বেশ ভাল লাগছে। কাশীতে গঙ্গাই ভাল লেগেছিল। তুমিই বল একই লোকের নাকটা ভাল কি

মুখটা ভাল, একথা উঠে কি করে? মানুষটাই যদি সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ সুন্দর হয়, তার নাকই দেখ বা মুখই দেখ সবই ত সেই পূর্ণ চিরসুন্দরকে হৃদয়ে এনে দেয়। দেয় না কি? সে যে কত সুন্দর তা'ত কথায় বলা যায় না, দেখে শেষ করা যায় না, তার সবটুকুই সুন্দর, অতি সুন্দর। তাই যখন যেখানে থাকা যায়, সেখানকার সবই সুন্দর লাগে। তারপর দেখে গঙ্গাই বল, আর গোমতীই বল, সবই ত অন্তরে একসঙ্গে রয়েছে। একটা আস্‌ছে, আর একটা চলে যাচ্ছে ও আর পাওয়া যাচ্ছে না, এমন ত আর নয়। তাঁর কথা ভাব দেখি? সেখানে ত সবই চিরবর্ত্তমান। গোমতীর তীরে বসে গঙ্গাকেও অনুভব করা যায়, আবার গঙ্গার ধারে বসে গোমতীকেও। আর বল বাবা, কেই বা দেখে? আর কা'কেই বা দেখে? দুই ত আর নয়। সবই ত এক, একদম একই।"

একজন হিন্দুস্থানী ভক্ত বল্লেন, "মাতাজী, এখানে মহাবীরের মন্দির, চারধামের মন্দির আপনি এসব দেখেছেন কি?"

মাতাজী ঘাড় নেড়ে বল্লেন, "কই তা'ত হয় নাই।"

একজন মুসলমান সাধক বল্লেন, "মাতাজী, এখানে কয়েকটা দেখবার মত মসজিদ ও ইমামবাড়া আছে। আপনি দেখতে যাবেন না?"

মাতাজী বল্লেন, "স্থান ত অনেক আছে। কোথাও ত যাইনি, বাবা। মোটরে করে ওরা সেদিন নিয়ে গিয়েছিল। কি সব কবর রাস্তায় পড়েছিল।"

মুসলমান সাধকটি বল্লেন, "আর একদিন আপনি এসব নিশ্চয়ই দেখ্‌বেন; আমার আপনাকে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়।"

সকলের সব কৌতূহলে অন্ত করে মাতাজী বুকে হাত রেখে একমুখ হেসে বল্লেন, "দেখ বাবা, মন্দির বল, মসজিদ বল, সব ত এখানে

সঙ্গে রয়েছে। সকল দেবতার যিনি তাঁর ত এইখানেই বাস। কেমন কি না?"

সকলে চুপ করলেন। আমি কথাটিকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম, "মাতাজী, শুনলাম, কাশী থেকে এখানে আসবার পূর্ব্বে আপনি মৈনপুরী গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে কি দেখলেন?"

মাতাজী খুসী হয়ে বল্লেন, "শুনবে বাবা? সেখানে গিয়ে জানলাম, কত মাইল দূরে যেন এক গ্রামের মন্দিরে, একটি মেয়ে মৌনী হয়ে আজ নবছর ধরে অবিরাম নাম জপ করছে। কারও সঙ্গে কথা কয় না। দেখতে যাওয়া হয়েছিল। গিয়ে দেখা গেল, মন্দিরের সংলগ্ন একটা ঘর কয়েকজন মিলে নির্ম্মান করে দিয়েছে। মেয়েটি আগে মন্দিরের কাছেই গাছতলায় বসে নাম জপ করত। ঝড়ে, জলে, সব সময়েই একই ভাবে বসে থাকত। সেই জন্য, একটা পৃথক কামরা তারই জন্য নির্ম্মান করে দেওয়া হয়েছিল। সাধিকাটিকে এনে সেখানে স্থাপন করা হোল। কিন্তু সে আবার মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত। তারপর তাকে খুঁজে ফিরিয়ে আনতে হোত। সেই জন্য নির্ম্মাণকর্ত্তারা সেই ঘরের ভিতর দিয়ে ছাদে যাবার সিঁড়ি করে দিল। যা'তে ছাদে গিয়ে মাথায় হাওয়া লাগতে পারে। আবার ইচ্ছামত নীচে এসে ঘরে বসতে পারে। কি চমৎকার ভাবটি দেখা গেল। শুধু ইসারা করে, হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে জানায় যে আরও তিন বছর তাকে বসে থাকতে হবে। তার ন'বছর হয়ে গেছে; তিন বছর বাকি। কারও সঙ্গে কোন কথা কয় না। একেবারে মৌন থাকে।"

আমার মনে হলো, মাতাজী দেবতাকে খুঁজতে পৃথিবীময় ঘোরার কথা না বলে, বিশ্বের কোথায় কোন্ অজানা সাধিকা নীরবে নিভৃতে

ঈশ্বরের উপাসনায় মগ্ন আছেন তাঁর কথা বেশী করে বল্লেন কেন। তবে কি লোকে বুঝবে যে ভগবানের চেয়ে ভক্তই তাঁর বেশী প্রিয়পাত্র? তিনি হিন্দু ও মুসলমান সাধকদের এই কথাই জানাতে চাইলেন কি যে প্রকৃত ভক্তকে দেখলে ভগবান্‌কে দেখা হয়, কারণ ভক্ত ও ভগবান্ যে অভিন্ন?

তাঁর নিকটে কয়েকটি মহিলা বসেছিলেন তাঁদের বল্লেন, "ঐ রকম ধ্যান ধরে বসে থাকতে পারো? যতদিন পারো,যতক্ষণ পারো। যদি সারাক্ষণ না পারো, নিয়ম বেঁধে নে'বে। আচ্ছা আজ হলো না, কাল সমস্ত দিন বসব। এই পনেরো দিন বিশেষ করে ঈশ্বর চিন্তা করব। এই দু'টো মাস কোন দিকে তাকাব না। তবে ত চঞ্চল মন, আরও চঞ্চল হয়ে তাঁর দিকে ঠিক যেতে পারবে। দেখ, চঞ্চল মনকে স্থির করতে পারছ না বলছিলে একটু আগে, এই ভাবেই স্থির করবার উপায় হয়।"

একজন আফিসের বড় কেরানী বসে ছিলেন আমরা তাঁকে জানি। মাতাজী কেমন করে জানবেন? তিনি বল্লেন, "মা, কথাটা বোঝা গেল না। চঞ্চল মনকে আরও চঞ্চল করার কথা কি বল্‌ছেন?"

মাতাজী পরিষ্কার করে বল্লেন, "দেখ বাবা, এই চাকরী পাওয়ার জন্য মন চঞ্চল হয় কি না? চঞ্চল হলে কি কর? আরও চঞ্চল কর কি না? চাকরীর অন্বেষণ কর, দরখাস্ত কর, দেখাশুনা কর, তারপর অনেক কষ্টের পর, চাকরী হবার থাকলে হয়েও যায়। হয়ে যায় না কি? সেই রকম সেই পরমাত্মার জন্য চঞ্চলতা হলে মনকে স্থির করতে যাবে কেন? মনকে আরও চঞ্চল করে দেবে। যত বেশী চঞ্চল হবে ততই তোমার আশা পূরণের আশা হবে। হবে না কি?

আমার নিকটেই কয়েক জন হিন্দুস্থানী বর্ষীয়সী মহিলা বসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনের প্রশ্ন তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করছিলেন না;

আমাকে আভাস দিলেন ও জিজ্ঞাসা করতে বল্লেন।

আমি বল্লাম' "মাতাজী, আপনার কাছ থেকে জানবার জন্য আমার উপস্থিত বোনেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন, যদি আপনার কৃপা হয়, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা মনে রেখে ভারতবর্ষের মেয়েদের কিরূপ ভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করা উচিত সে সম্বন্ধে আপনি একটু খানিক বলবেন কি?"

আমি বাঙলাতে প্রশ্ন করিলেও মাতাজী যেমন সকল কথা হিন্দীতে বলিতেছিলেন সেই মত বলিতে লাগিলেন যাহাতে সকলে ঠিক মত বুঝিতে পারে।

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, এ'টা কলিকাল বলে সব দিক থেকেই কষ্ট বেড়ে গেছে। মেয়েদের কষ্টও কিছু কম নয়। তবে যত কষ্টই হউক্ ভারতবর্ষের মেয়েরা তাঁদের আদর্শ ধরে থাকতে চায়। পতিরূপে সেই পরমগুরুর সেবা, বালগোপালদের সেবা, অতিথি অভ্যাগতদের পূজন, আত্মীয় স্বজনের যত্ন, মেয়েরা প্রাণপণে করে থাকে। আর এই সব কি রকম করে করলে আরও বেশী কল্যাণ হয় জান?

মাতাজী দৃষ্টিকে একটুখানিক সঙ্কুচিত করে একটুখানিক সলজ্জভাবে বল্লেন, "এই শরীরেও কতকটা এইভাবে জীবন কেটেছে ত। সে সময়ে, খুব সাবধানে, পরিষ্কার ভাবে, রান্না করতে করতে ভাবতাম, 'দেবতার জন্য ভোগ চড়াব; জলের ঘটিতে যেন পা লেগে না যায়।' খুব পবিত্রভাবে ব্যবস্থা করে সবাইকে খেতে দিলে মন কতই খুসী হয়। দেবতাকে খাওয়াচ্ছি, যা' কাজ করছি, দেবতার জন্য করছি। সব কাজের মধ্যে তাঁর চিন্তন, তাঁর ধ্যান, তাঁর পূজন, চলতে থাকবে। যখন যেটা

সুবিধা হবে চলতে থাকবে। তবে সব সময়ে পরম দেবতাকে সঙ্গে রাখা। তাঁর সঙ্গে একেবারে মাখামাখি ভাবে থাকা।"

"কিন্তু এটাও ঠিক, পতিকে দেবতা বলে মানা যেমন দরকার, তেমনই পুরুষও যেন পত্নীকে গৃহলক্ষ্মীর মত দেখেন। যিনি বেশী শক্ত হবেন তাঁকে ততই বেশী করে ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। একটি অনুকুল মুহূর্ত্ত যেন বয়ে না যায়। একজনের চেষ্টায় আর একজনের কাজ হবে। এইভাবে দুজনে দুজনকে সাহায্য করে গেলে দুজনেই ভগবানের দিকে এগুতে থাকবে। দেখ, আর একটা কথা। শুদ্ধতা বেশী করে অর্জ্জন করতে হবে। এই জন্য সংযম দরকার। একেবারে স্থির করে বসবে যে এ বছরটা সংযম পালন করবে। নয়ত এই কয়টা মাস। তা'ও যদি না পারো এই কয়টা সপ্তাহ অথবা এই কয়টা দিন। ক্রমশঃ সময় বাড়াবে। কিন্তু সঙ্কল্প করে করবে। সংযমের ব্রত উদ্‌যাপন করবে। যত অভ্যাস করবে ততই উভয়ের কল্যাণ হবে। পরমেশ্বরের কাছে যাবার জন্য সমস্ত জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারলে তবেই ত আনন্দ? কেমন কি না? দেখ্‌বে, পরমেশ্বর সাহায্য করবেন। তিনিই ত করেন, তিনিই ত করান। সব শক্তি তাঁরই। তাঁকে ধরে থাকলেই সব পাবে। পতি আরও সুন্দর হবে। স্ত্রীকেও আরও ভাল লাগবে।"

আমি সবাইকে শুনিয়ে হিন্দীতে বল্লাম, "মাতাজী, যেখানে পতি পত্নীর মধ্যে প্রেম আছে সেখানে ত এসবই সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান কাল ত মেয়েদের বিবাহ বাপ মা নিজেদের পছন্দ মত দেন। সেখানে গোড়াতেই কিছু প্রেম সব সময়ে থাকে না। আবার পরেও অনেক সময়ে মনান্তর হয়। এ সবের জন্য কি প্রয়োজন? গার্হস্থ জীবনের উন্নতি আমাদের দেশে কি করলে সম্ভব হবে? এটা যদি আপনি ব'লেন তা'হলে মেয়েদের অনেক কল্যাণ হয়।"

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, কালের দোষ সব দিক্ থেকে এসে পড়লেও কালকে দোষ দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এই কলিকালের মধ্যেই ত আবার সত্যযুগও আছে? বল ত, কাল কা'কে বলে? আজকের মধ্যে গত কাল নেই? আগামী কালও নাই কি? আজকের দিনে শিশুকালের সব নেই কি? আবার বৃদ্ধ বয়সে যা আসবে তা'ও ত রয়েছে? দৃষ্টির দ্বারাই আমরা কালকে বেঁধে নিই। এই তাঁবুতে বসে কেউ বা এইটুকু মাত্র দেখ্‌ছো। কেউ বা কলিকাতা, বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরে আসছে। সময়ই বল, স্থানই বল, সবই ত মানুষের মনগড়া সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। মনটাকে বড় করলেই সময়ের সীমাও বেড়ে যায়। স্কুলে গিয়ে ছেলেরা লেখাপড়া শেখে কেন? এখনকার যুগে সেই প্রাচীন যুগের সব কিছু স্মরণ করতে শিখে, আবার অনাগত কালের ছবিও তাদের মনে রেখাপাত করে না কি? এ তো গেল স্মরণের কথা। এছাড়া সত্য ভাবে, নিবিড় ভাবে, সমস্ত কালকে অনুভূতির দ্বারা পাওয়া যায়। এম্নি করে কলি যুগেই সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা, সবই ত এক সঙ্গে আছে। আবার এই সমস্ত কালের উপর সেই অখণ্ড মণ্ডলাকার পরমেশ্বর তিনিই ত নিজকে প্রকাশ করছেন। তিনিই ত ধরা দিচ্ছেন। দিচ্ছেন না কি?"

মাতাজী বল্‌তে লাগলেন, "কালকে যেমন দৃষ্টি দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে, সেইমত নিজকেও শুদ্ধ করবার কথাও মনে রাখা দরকার।"

একটু চিন্তার সুরে আবার বল্লেন, "দেখ, প্রাচীন কালে চতুরাশ্রম ছিল,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেকটি আশ্রম সাধনার স্তর ছিল। অবশ্য কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে গিয়ে আর কোন আশ্রমে ঢুকতো না, এমনও ছিল। সবাই ঠিক।

চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনে যাদের মন লেগে গেল তারা আবার অন্য আশ্রমে ঘুরবে কেন? তবে এ'টা মনে রেখো, যারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গৃহস্থে ও গৃহস্থ আশ্রমের পরে বানপ্রস্থে আসতো তাদের জীবনেও মূলে সেই ব্রহ্মচর্য্য ছিল। প্রথম আশ্রমের উপর ভিত্তি করেই ত সমস্ত জীবন। তাই ব্রহ্মচর্য্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি খুব বেশী করে থাকত। এটাকেই যদি সকল নরনারী অভ্যাসে রাখবার জন্য চেষ্টা করে তা'হলে কালও অনুকুল হবে। কাল বিগড়েছে, বেশতো তাকেও অনুকুল করে লও। ব্রহ্মচর্য্য পালনে মন দাও। নিজের দুর্ব্বলতাগুলো খুঁজে, এটা করব না, ওটা করব না, এরকম চেষ্টা যেন কোরো না। সব সময়ে মনে রাখ্‌বে, "এইটা করব", আর "এইটা করলে ভাল হয়।" মনকে বোঝাবে, রাজী করাবে। ভাল বৃত্তিগুলো সাধন করবে। মন্দগুলো আপনই সরে যাবে। যদি জবরদস্তি করে মন্দগুলোকে তাড়াতে চেষ্টা কর ত'হলে অগ্রসর হওয়া শক্ত হবে। ভাল হবে, ভাল করবে। ভালোর দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বে। সকলের সঙ্গে ভাল ববেহার করলে ব্রহ্মচার্য্য আরও পাকা হবে। রাগ, হিংসা, লোভ কিছু আর থাকবেনা। রাগ হলে, লোভ হলে, কোন মন্দভাব এলেই, বুকের মধ্যে যিনি রয়েছেন তাঁর কাছে তৎক্ষণাৎ আত্মনিবেদন করে জানাবে, "রক্ষা কর, তুমি রক্ষা কর।" এমন অবস্থায় সব সময়েই ভাববে, আর একজনের কেন বিগড়াই? বিগড়ানোর কাজে যদি সহায়তা না কর তা'হলে তোমার অবস্থা সাধনার অনুকুল হবে। হবে না কি?"

"চল, আর একটু এগিয়ে যাই। এইভাবে চলতে চলতে, তখন জীবনের পরম দেবতাকে আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরবে। সর্ব্বদা মনে করবে তিনিও তোমাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। তিনি তোমাকে ধরেন, তুমি তাঁকে ধরো। তিনি তুমি ধরতে ধরতে এক হয়ে যাও। এক

ভাব মনে রাখবে। দুই ভাব হলেই ত আসা যাওয়া। আবার, জন্মমৃত্যু চক্রের মত ঘুরবে। একভাব রাখবে। আত্মনিবেদন করে আপনাকে পাবে।"

আবার সঙ্কোচের সঙ্গে মাতাজী বল্লেন, "এই শরীরের জীবন যখন গার্হস্থ জীবন ছেড়ে গেল, কেউ কেউ মনে করল পাগল হয়ে গেল বুঝি? নিশ্চয়ই কোন রোগ হয়েছে।"

মাতাজী মুখ নত করে বলতে লাগলেন,"আমাকে যে ধরে নিয়ে যেতে এল, সে নিজেই শেষে মাথা গোল করে ফিরে গেল। যাক্ সে সব কথা। তবে এ'টা তোমাদের জীবনে মনে রাখ্‌তে হবে, পরমেশ্বর যখন সহায় রয়েছেন, সব বাধা বিঘ্ন কেটে যাবে। এ বিশ্বাস ত রাখতেই হবে। যে তাঁকে একবার পেয়েছে তার ত একথা জানা আছে। আর যে পায়নি বলে মনে করে, তারও পেতে ইচ্ছা করে না কি? এত বড় আশ্রয় কি আর আছে? এই ত আশ্রয়, সর্ব্বকালের, সকল মানবের, সব পরিবর্ত্তনের মধ্যে। জীবনের মধ্যে এই ভাবটি আপনি ফুটে উঠ্‌বে বলেই ত মানুষ নিরন্তর অপেক্ষা করে।"

মহিলাদের দিকে চেয়ে মাতাজী বল্লেন, "মাঈলোক! দিয়া জ্বালিয়ে রাখো, দিনরাত জ্বলুক, সারাক্ষণ জ্বলুক। ভগবানের কৃপা হবেই। তাঁর কৃপার উপর ত সকলের জীবন, ইহলোক, পরলোক, নির্ভর করছে।"

অনেকক্ষণ সকল চুপ করে রইলেন। পরে আমি বল্লাম, "মাতাজী, অভিমান বড় শত্রু। অভিমানকে কি করে বশে আনতে হয়?"

মাতাজী বল্লেন, "সে আপনা হতেই পালায়। আগেই ত বলেছি বাবা, কাউকে তাড়াতে যাবে না। গ্রহণ করবে, গ্রহণের দিকে সব সময়

দৃষ্টি রাখ্‌বে। ত্যাগের দিকে নয়। যখন যে অবস্থা হবে, যে মানুষ আসবে, যে বিপদ সামনে পড়বে, মনে রাখবে, তিনিই আসছেন। গ্রহণ করবে। ত্যাগের কথা মনে আনবে না। আর যা' ত্যাগের বস্তু তা' আপনা হতেই সহজে ত্যাগ হয়ে যাবে। তোমাকে ত্যাগ করতে হবে না। আর ত্যাগ কা'কে করবে, বাবা? কোন কিছুকে "ত্যাগ করছি, ত্যাগ করছি" ভাবলে পর, আরও বেশী করে অন্তরের মধ্যে গ্রহন করা হবে না কি? কাকে ত্যাগ করবে, বাবা? সবই ত তিনি। যজ্ঞ কর্ত্তা তিনি, আহুতি তিনি, দিচ্ছেন পাচ্ছেন সবই ত তিনি।"

আমি বল্লাম, "মাতাজী, প্রেমের আদর্শের দিক্ থেকে হরগৌরী ভাব সাধনার বেশী অনুকূল না রাধাকৃষ্ণ ভাব?"

মাতাজী বল্লেন, "বাবা, ওসবই এক। যার যেটা ভাল লাগে তার সেই পথেই যাওয়া ভাল। নিজের মনই বলে দেবে, কোন্‌টা ভাল। তারপর সেই দিকে চলা। চলার ত, বাবা, শেষ নাই। তিনি অনন্ত। অনন্ত দিয়ে অনন্তকে অনন্ত কাল পাওয়া। এই প্রবাহের নামই ত জীবন। এ'র শেষ আছে কি? সব আদর্শ যে সেই একেতেই আছে তা' যত এগুবে বুঝতে থাকবে। মত নিয়ে কিংবা মতের বিবাদ নিয়ে যদি পড়ে থাকো তা'হলে মতকে পাবে, বিবাদকে সাথী করা হবে, তাঁকে সঙ্গী করা হবে কি? তবে এ'টা সত্যি যে মতগুলো তাঁকেই অবলম্বন করে রয়েছে। এই মতগুলো অন্তরের মধ্যে সরে সরে যায়। বুঝলে না? যেমন ধর, কলিকাতা যাবে, রেলের টাইম টেব্‌ল দেখ্‌লে। টাইম টেব্‌ল দেখ্‌লেই কিছু কলিকাতা যাওয়া হোল না। হোল কি?" বলে একমুখ হাসলেন।

মাতাজী বলতে লাগলেন, "টিকিট কিনে, রেলে বসে, চলতে হবে, পথে কত ষ্টেশন, একটার পর একটা আসবে, চলে যাবে। সবই ভাল লাগবে। কলিকাতায় পৌঁছানোর আনন্দ পেতে থাকবে না কি? বাবা,

উদাহরণ দিলাম। আবার এও সত্য যে যাবে কোথায়? তুমি ত কলিকাতাতেই রয়েছ। তাঁর মধ্যেই রয়েছ, থাকবে, এর অন্যথা হবে কি?"

"বাবা, মনে রেখো, সব তোমাতেই রয়েছে। যে প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্নকর্ত্তা তিনি। যিনি উত্তর দেন তিনিও তিনি। যেখানে প্রশ্ন, সেখানেই উত্তর। সবই জানার মধ্যে। সকল জানা, বা যা' মনে করছ অজানা, সবই সেই পরমদেবতার মধ্যে।"

প্রসঙ্গ এইখানেই তখন শেষ হোল। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। U.P. Government এর Adviser ডক্টর পান্নালাল আই, সি, এস্ ও তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রচুর ফুলের তোড়া প্রভৃতি লইয়া সবান্ধবে শামিয়ানায় প্রবেশ করলেন। সকলের দৃষ্টি ক্ষণেকের জন্য তাঁদের দিকে ফিরল। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে হলেও লেখক পাছে নিজের দুর্ব্বলতাবশতঃ স্বীয় চিন্তার ধারা হারিয়ে ফেলেন সেই কারণে শঙ্কিত মনে সেখান থেকে উঠে, অন্ধকারের মধ্যে পথ করে, ঘর পানে ফিরলেন। মাতাজীর ছবিটি, তাঁর কথাবার্ত্তা, বুকের মধ্যে রাখবার প্রায়াস জগন্মামাতা কি ব্যর্থ করবেন? সযত্নে, গোপনে, কোথায় এ সব রাখ্‌ব? ভাল কথা আমারই মনে শুধু রাখ্‌ব কি?

(৫)

মাতাজীর অদর্শনে

৭ই ফেব্রুয়ারী—মাতাজী আজ সকালে দেরাদুন এক্সপ্রেসে কাশী চলে গেছেন। শুনে অবধি আমার মনটা ভাল লাগছে না আজ সন্ধ্যাবেলা আর তাঁর দর্শন পাব না। তবু গেলাম বৈকালে, সেই স্থানটিতে,

যেখানে তিনি ছিলেন। তাঁর কয়েকজন ভক্ত এখনও সেখানে রয়েছেন। যাঁদের দেখা পেলাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সন্ন্যাসিনী শ্রীমতী গুরুপ্রিয়া দেবী, যিনি বাঙলায় "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের রচনা করেছেন ও যাঁকে "দিদিজী" বলে আমিও আজ থেকে জানলাম। দিদিজীর নিকট শুনলাম, কাল অখণ্ড কীর্ত্তন সারাদিন ধরে হবে ও হয়ত সন্ধ্যার সময় মাতাজী ফিরে আসতেও পারেন। তিনি ত আমায় এইরূপ আশা দিলেন।

আবার কবে মাতাজীর সঙ্গে কথা কইতে পাব, কে জানে। তাই মনে মনে তাঁর সঙ্গে কথা কইছি। তাঁকে সেদিন সকলে মালা পরাবার জন্য আমার হাতে মালা এনে দিলেন। বড় কুণ্ঠা বোধ হোল। জীবনে ত কোথাও কখনও মালা পরাই নাই। তবু সকলের কথামত পরাবার জন্য গেলাম। কোন মতে মালার অর্ঘ্য তাঁর গলায় অর্পণ করলাম। কিন্তু তার পরেই মনে হোল আমার হাতের মালা তাঁর কাছ অবধি পৌঁছাল না। তিনি লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে রয়েছেন, আর আমি যেখানে পড়ে আছি, সেখানেই পড়ে আছি। মাতাজী আমার কাছ থেকে এত দূরে, এই অনুভূতি নিয়ে রিক্ত হস্তে শূন্য মনে নিজের স্থানে ফিরে এসেছিলাম।

আজ মাতাজীর স্থানে গিয়ে মনে হোল, এই ত তিনি আমার কাছেই রয়েছেন। আমার অন্তর জুড়ে, আমার দৃষ্টি জুড়ে, আমার দৃষ্টির অন্তরালে তিনিই রয়েছেন। আমার কাণে তাঁর বাণী ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। যখন তিনি সশরীরে আমার কাছে উপস্থিত থাকেন, তখন মনে হয়েছিল তিনি আমা হতে কত দূরে। আর আজ যখন অশরীরী হয়ে উপস্থিত রয়েছেন, তখন দেখছি তিনিই ত আমাময় হয়ে রয়েছেন। উপনিষদের

একটি বাণী মনে পড়ছে, তিনি দূরেও আছেন, আবার কাছেও রয়েছেন। তবে কি যখন সাকার ভাবে কাছে থাকেন, তখন তাঁর দূরত্ব উপলব্ধি করে মানুষ ব্যাকুল হয়? আর নিরাকার রূপে যখন দূরে বলে মনে হয়, তখন তিনি সারাটা অন্তর দখল করে মানুষকে তৃপ্তি দেবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন?

৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি সাড়ে একারোটা। আজ মাতাজীর স্থানে সারাদিন অখণ্ড কীর্ত্তন হয়ে গেল। আমি সকালে, বেলা দশটা নাগাদ, গিয়েছিলাম ও যতক্ষণ না শ্রীশ্রীমা সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছিলেন ও দেখা দিলেন ততক্ষণ ছিলাম। মাতাজীর গৃহস্থ ভক্তেরা সারাদিন প্রচুর মিষ্টান্ন, ফলাহার, প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তার উপর নদীর ধারের বাতাস, একটা চঞ্চল প্রতীক্ষার মত, সকলের অন্তর বাহির ছেয়েছিল।

সারাদিন "মা" নাম কীর্ত্তন হোল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এখনও চক্ষে লেগে আছে। কাণের ভিতর দিয়া এখনও "মা" নাম অন্তর স্পর্শ করছে।

মা নাম বড় মিষ্ট লাগল। সারাদিন ঐ একটি নাম ধ্বনিত হোল। জীবের সেই প্রথম উচ্চারিত নাম। সকল জাতির মানুষ এই নাম ধরে পৃথিবীতে আসিয়া প্রথম হাঁক দেয়। তারপর আর সব সম্পর্ক ক্রমশঃ আসে। মা'কে শিশু চিনিয়া লয়। আর সব সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে তার জ্ঞান জন্মায় যখন সে মাতার নিকট হইতে জানিয়া লয়। মাকে চিনিতে কেহ শিখায় না। সেই "মা" নামটি হোল সকল ভাষায়, সকল ভাবের, সকল আবেগের ও সকল আকাঙ্খার মূল প্রস্রবণ। এই ধ্বনির সঙ্গে কী অভিনব পরিচয় মানুষের। এরই উপর ভিত্তি করিয়া মাতৃভাষার প্রাসাদ মানুষের জীবনে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত সংসার, সমস্ত সংস্কৃতি, সকল শাস্ত্র, সকল দেবতা ও সকল জীবের পরমগতি পর্য্যন্ত "মা"

নামের কাছে দণ্ডবৎ। মা আছেন বলেই জীবন আছে এবং মরণকে পর্য্যন্ত জীব ভয় করে না। মায়ের কোলে এসে সে নামে, মায়ের কোলে বিচরণ করে ও আবার ভবের খেলা হলে মায়ের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ে, যতক্ষণ না নূতন ভোরে, আবার অভিনব সুরের আগমনীর গান মায়ের কোলে শিশুকে জাগায়। পিতৃহীন বালক মায়ের কৃপায় মানুষ হতে দেখা গেছে, কিন্তু মাতৃহীন শিশু এ পর্য্যন্ত জন্মাতে কেহ দেখেছ কি? যীশুর পিতৃত্ব সম্বন্ধে যত কিছু গল্প থাকুক, মাতা যে মেরী ছিলেন সে সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান নহেন। মায়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে আসিতে হয়, তাই মায়ের সমস্ত ছাপ সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মানুষ চিরদিন বহন করে।

"মা" নামের তুল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ আর নাই। যাঁহাকে "অক্ষররূপিণী বেদজননী" বলা হয় সে'ত এই মা নাম। বেদের হিসাবে অ,উ, ম, এই তিনটি অক্ষর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বোঝায় ও তিনটি মিলে "ওমা" অথবা "ওম্" উচ্চারণ করলে সমাধি বোঝায়। সমাধি শীর্ষক এই শব্দটি আর্য্যভূমির সকল শাস্ত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে। "ওম্" এই মন্ত্রের পর ব্রাহ্মণ তনয়ের জীবনে অবতরণ করে গায়ত্রী মন্ত্র। তা'তেও সেই মায়ের ছবি, প্রভাতে কুমারীরূপে, মধ্যাহ্ন যুবতীর বেশে ও সায়াহ্নে বৃদ্ধার স্বরূপে ব্রহ্মচারীর হৃদয়মনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। তা' ছাড়া "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা" মন্ত্রও শক্তি আরাধনার মূল কথা। বৈষ্ণব সাধনায়েও "মা" বাদ পড়েন নাই। যশোদা না কৃপা করলে যশোদার দুলালকে পাব কোথায়? খৃষ্টানগণ হয়ত বলবেন, মেরী মাতার কৃপা না হলে মেরী তনয়কে পাওয়া যায় কি? তা' ছাড়া খৃষ্টানগণ প্রার্থনার শেষে "আমেন্" অতি অবশ্য উচ্চারণ করবেন, তা' যে ভাষায় প্রার্থনা জানান না কেন। তবে কি প্রার্থনা মঞ্জুর করবার এই "মা" শব্দই একমাত্র অধিকারিণী? মুসলমানেরা

মুহম্মদের নামে "মুহম্ম" বারবার উচ্চারণ করেন। আর "আল্লার" নামে মা না থাকলেও তাঁর দুইটি বিশেষগুণে "রহমান্" ও "রহিম" শব্দে মায়ের নাম পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছে। কে রক্ষা করিবে ও দয়া করিবে মা ছাড়া?

প্রত্যেক নরনারী "মা" বলে নিঃশ্বাস ফেলে। "মা" বলে ডাকলে জগতের সকল মেয়ের সাড়া পাওয়া যায়। মায়ের নাম করলে পুরুষের মন শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়। "মা" সবারই সব চেয়ে অমূল্য সম্পদ। আর সকলের স্নেহ ভাগ করে লওয়া যায়, কিন্তু মায়ের স্নেহের ভাগ হয় না। যত ভাগ করা যায় তত বেড়ে যায়। আর কেহ অপরাধের ক্ষমা করুক বা না করুক মা চিরদিন সব সহ্য করে সব অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার অপরাধ যত বেশী হউক্ না কেন, মায়ের দয়ার চেয়ে ত বেশী হবে না!

এমন মধুর নাম আর নাই। সেই নাম আজ সকল প্রদেশের নরনারী আমার কানে সারাদিন বর্ষণ করল। আমার শুষ্ক কণ্ঠেও সেই নাম ধ্বনিত হোল। সূর্য্য অস্ত গেল, ঐ নাম করতে করতে। প্রদীপ জ্বলল, মনের আগুনও দাউ, দাউ করে জ্বলতে লাগল, ঐ নামে। চোখের জলে আরও বেশী করে উত্তাপ বাড়তে লাগল। "মা" নামের তপস্যা অতীব মধুর, ঐ নামের গুণে যে সব তাপ সহন করা ও বহন করা যায়।

মাতাজী এই নামের ধ্বনির মধ্যে এসে পৌঁছিলেন। তাঁর আগমনে চারদিকে মাতামাতি আরও বেড়ে গেল। আমার ইচ্ছা হোল, মায়ের বেদীর কাছে, যাহা সারাদিন শূন্য ছিল, একটুখানিক জায়গা করে বসে যাই ও অপেক্ষ করি। কিন্তু ঠেলাঠেলি, চাপাচাপিতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। মাতাজী এসে বসলেন। আমি একটু দুরেই, দুইটা শ্রেণীর পিছন

অবধি পৌঁছে ছিলাম। পার্শ্বস্থিত কোন বাল্য বন্ধু কানে বল্লেন, "মাতাজী তোমাকে দেখে হাসছেন।" মাতাজী ত সব সন্তানদের দেখেই হাসবেন,আমার এমন কি গুণ আছে যে অকারণে আমাকে উপলক্ষ্য করে হাসবেন?

ঠেলাঠেলির মধ্যে আর বসে থাকতে ভাল লাগল না। কাল সকালে মাতাজীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পাবার ইচ্ছা দিদিজীকে জানিয়ে ও ভাইজীর লিখিত বাঙলায় "মাতৃদর্শণ" শীর্ষক পুস্তকখানি রাত্রিটুকুর জন্য চাহিয়া লইয়া অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। বেরুবার পূর্বেই কেহ কেহ জানালেন, "ভোগ লাগবে, প্রসাদ পাওয়া যাবে।" আমার মন গেয়ে উঠল, "সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই ল'ব।" তা'ও আজ রাত্রে নয়। কাল সকালে, বাসি করে, মায়ের প্রসাদ খাব। দেখি আমার জন্য মা কি রাখেন!

এর পর আর প্রতিদিনকার দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ করব না। কয়দিনই বা মাতাজীকে কাছে পাব। আবার হয়ত একদিন শীঘ্রই শুনতে পাব, তিনি চলে গেছেন অন্যত্র। এবার থেকে তাঁর কথাবার্ত্তা আরও বেশী করে ভাববো। আর যা' ভাববো তা' অসঙ্কোচে লিপিবদ্ধ করব। তার মধ্যে থাকবে মায়ের শক্তি ও আমার অক্ষমতা। আমার দুর্ব্বল অন্তরে যতটুকু তাঁর স্পর্শ আমি পাব তার চেয়ে বেশী আমি কেমন করে জানাব? তা'ও যদি মায়ের ইচ্ছা হয়। তাঁর ইচ্ছাই চলুক। ওঁর মুখর শিশুকে যতক্ষণ না তিনি নীরব করে দেবেন ততক্ষণ আর আমার উপায় কি?